12

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ :

অধ্যাপক কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

1974-75

পত্রিকা সম্পাদক :

পিনাকী প্রসাদ রায়

৪৭তম সংখ্যা ১৯৭৪-৭৫

আশুতোষ কলেজ, ৯২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
হইতে অধ্যক্ষ শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
প্রিণ্ট হল, ১০৩, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫
হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

Foreword	Sri Nirode Kr. Bhattacharya (Principal)	
পত্রিকাধ্যক্ষের কলমে	ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	১
সভাপতি যা ভাবেন	অধ্যাপক অজয় কুমার সেন	৭
আমার কথা	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৯
সাধারণ সম্পাদকের কলমে	অঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১০
রূপ ও অরূপ (কবিতা)	আশিস সেন	১২
অমরত্ব (কবিতা)	শিশির সরকার	১৩
ঘুসর অপরাহ্ন (কবিতা)	দেবাশিষ মজুমদার	১৫
স্বস্ত (কবিতা)	সৌরেন্দ্র নাথ হাজরা	১৬
আন্দিক (কবিতা)	কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৭
কোয়েল (কবিতা)	প্রণব ভট্টাচার্য	১৮
এক বর্ষণমুখর রাতে (কবিতা)	অভিজিৎ দাস	১৯
সমাজ সেবায় কয়েকটা বছর (সমীক্ষা)	ভড়িৎ কুমার দত্ত	২০
Rural Indebtedness (Essay)	Pronab Kumar Mukherjee	২৩
আমাদের প্রতিবেশী চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীকান্তীশ চন্দ্র মাইতি	২৭
প্রেমা ছড়ার সন্ধানে (প্রবন্ধ)	গোবিন্দ প্রসাদ সন্দোপাধ্যায়	৩৩
Democracy - is it at stake in India (Essay)	Debashis Ganguly	৩৭
চা-চিনি-পিরীচ-পেয়ালা (রম্য রচনা)	শ্যামল দাস	৪৪
ছাত্র বিশৃঙ্খলা : একটি সমীক্ষা (সমীক্ষা)	স্বপন কুমার ঘোষ	৪৮
রবিরেখা (গল্প)	প্রবীরজিত সরকার	৫১
সমাজ, দ্বন্দ্ব ও রাজনীতি (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক অমিতাভ বন্দোপাধ্যায়	৫৮
আশুতোষ কলেজ ছাত্রসমাচার (সংবাদ):		
ক্রীড়া বিভাগের পরিচালনায়	প্রণব মুখোপাধ্যায়	৬১
কলেজ কমন রুম	অমিত রায়	৬৩
সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে দু' এক কথা	পল্টু দেব রায়	৬৪
আশুতোষ কলেজ নূতন ছাত্রাবাস	বিমলেন্দু মাইতি	৬৫
আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস	রূপ কুমার নন্দ	৬৬

অনিবার্য কারণবশতঃ এবারের পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় এবং মুদ্রণপ্রমাদ কিছু কিছু থেকে যাওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত।

—পত্রিকা সম্পাদক

স্মরণীয় যাঁরা

আমাদের এই মহা বিদ্যায়তনের অধ্যাপনা ও পরিচালন কর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এমন কয়েকজনকে আমরা সম্প্রতি হারিয়েছি, তাঁদের অমর আত্মার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই :

১। ডঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন উপাচার্য্য, গভর্নিং বডির ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও সম্পাদক)

২। যতীন্দ্র মোহন মজুমদার (ভূতপূর্ব্ব গভর্নিং বডির সম্পাদক)

৩। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য („ „ „ সদস্য)

৪। অধ্যাপক প্রবোধ রঞ্জন সেন (ইংরাজী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

৫। „ প্রমথ নাথ দে („ „ „ „)

৬। „ রবি বসু (বিভাগীয় প্রধান : বঙ্গভাষা সাহিত্য শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, সদস্য এড হক কমিটি আশুতোষ, যোগমায়া ও শ্যামাপ্রসাদ কলেজ)

৭। অধ্যাপক অনিল চক্রবর্ত্তী (উপাধ্যক্ষ যোগমায়া কলেজ)

পড়বে.না আর পায়ের চিহ্ন

গত ৮ই বৈশাখ ১৩৮৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসত্য রঞ্জন বসুর পরলোকগমনে আমরা মর্ম্মাহত। তিনি ছিলেন আমাদের অনেক দুঃখ সংকটের সঙ্গী, আত্মার আত্মীয় হয়ে তিনি কত সময় বয়স ও জ্ঞানের ব্যবধান ঘুচিয়ে ছাত্র ও সহকর্মীদের খুব কাছে সরে এসেছিলেন।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমরা গভীর সমবেদনা জানাই।

FOREWORD

Writing a Foreword for the College Magazine has always been a pleasure and a privilege for the Principal for it offers one more channel—and an annual one—for opening out his mind to the Students of the College.

For nearly the last three years, the responsibility for running this great Institution has mainly developed on the Staff-teaching and non-teaching working in full co-operation with the students. While, unhesitatingly acknowledging the unstinted co-operation received from the general body of students and the Students' Union, we have to remind them and also all of us of the great tasks ahead and of the greater heights to climb. The Institution has to look ahead and all of us have to start on an expedition. The best way to have a successful expedition is to have a secure base and this base has to be built on our courage, vision, and social and intellectual awareness.

While remembering the great past and tradition of this College, while remembering the two great builders of the College, the Late Sir Asutosh Mookerjee and his worthy son the Late Dr. Syamaprasad Mookerjee, we must firmly resolved to fulfil the objectives of this College and raise the College to greater eminence. A College stands for a vital process in shaping the life, career and character of the students and lives in their life and success. My

colleagues and myself are fully aware of this process and purpose and we only want our students to share this awareness, to participate fully in this joint endeavour of attaining the common goal. If the past is an indicator we have every hope that in future also we shall not fail. If all of us-teachers, students and employees- agree on the common goal, as we cannot do otherwise, our small differences are narrowed down and the areas of agreement become continually enlarged. There can be no real conflict between liberty and authority, if there is a common understanding about the meaning and purpose of an Educational Institution like this of ours.

The years that the students spend in the college, though very few, are very important and critical for them. They never come back again. These years make or mar their future. They may in these years firmly build the foundation of their future life and of the life of the society in which they and the College have to live.

I can assure the students that my colleagues and myself will remain fully conscious of our responsibilities and shall always try to cover up our deficiencies, if any, and I shall appeal to the students to utilise fully the opportunities that the College with limited resources, can offer them, to join in a partnership with us in service and even sacrifice, if necessary. The cause of this Institution has to be served and let me hope that none of us shall fail.

N. K. Bhattacharjee
Principal

কলেজের অধ্যক্ষ সর্বজনমান্য
শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য।

সর্বভারতীয় ছাত্র
ও যুবনেতা
শ্রীসুব্রত মুখো-
পাধ্যায় আশুতোষ
কলেজ ছাত্রদের
সঙ্গে কিছুক্ষণ।

ছাত্রসংসদ সভাপতি অধ্যাপক অজয় সেন।

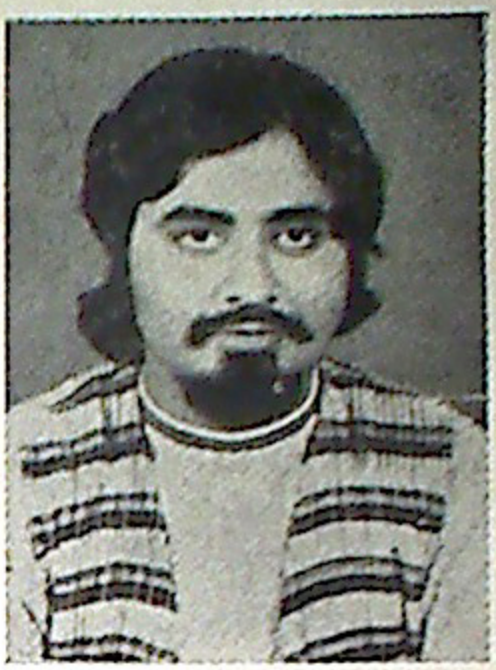

আশুতোষ কলেজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী
উদ্যমশীল ছাত্রনেতা
পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

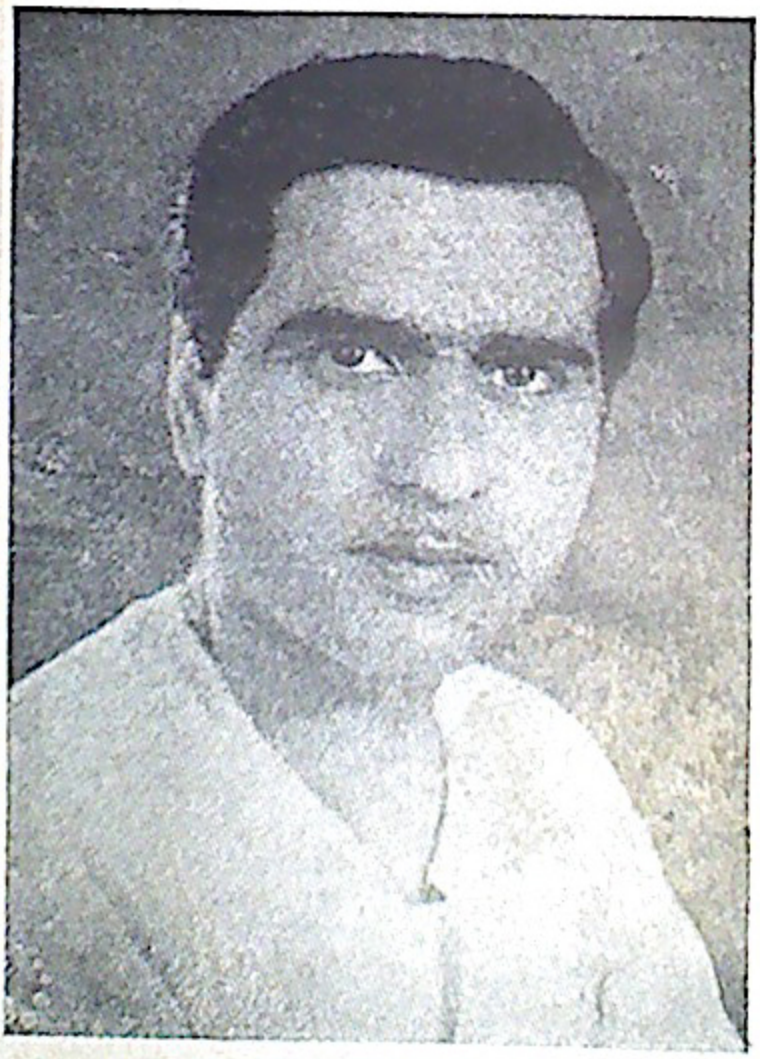

আশুতোষ কলেজ পত্রিকাধ্যক্ষ
ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়।

ছাত্রসংসদের ক্রীড়া সম্পাদক
প্রণব মুখোপাধ্যায়।

পত্রিকাধ্যক্ষের কলমে

ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক : বঙ্গভাষা,
সাহিত্য বিভাগ।

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা তার ষাট বছরের চিরযৌবন নিয়ে বেঁচে আছে। ১৯১৬-১৭ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার ন'বছর বাদে এর ছাত্রদের মুখপত্র এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে বলা যায় আশুতোষ কলেজ পত্রিকার জীবনে ১৯৭৫-৭৬ সাল তার সুবর্ণজয়ন্তীর গৌরবে সমুজ্জ্বল। তবে এই সংখ্যাটি নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকাশ করছি, তাই এটিকে পত্রিকার সুবর্ণ-জয়ন্তী হিসাবে চিহ্নিত করার সুযোগ কম। পরের সংখ্যায় এ ইচ্ছা পুরণের সম্ভাবনা রইল।

কলেজের ছাত্রদের চিন্তাভাবনা কল্পনা সৌন্দর্যবোধ, তাদের শিক্ষাসম্পর্কিত বহুবিধ কর্মধারা যেমন খেলাধুলা বার্ষিক উৎসবাদি কলেজ কমনরুম গ্রন্থাগার ছাত্রাবাস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাধারার নিরবচ্ছিন্ন রূপকে প্রতিফলিত করাই পত্রিকার একমাত্র লক্ষ্য। এই পত্রিকায় কলেজ অধ্যাপকদের রচনাও কিছু প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তার স্থান সংকুচিত। কিন্তু যেহেতু তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই প্রতিষ্ঠানেরই একটি শিক্ষাগত অঙ্গ তাই নিছক সাহিত্যচর্চা বা পাণ্ডিত্যপ্রচারের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কোনোরূপ আত্ম-প্রকাশের আশায় প্রলুব্ধ হন নি, কেন না তাঁদের লেখবার প্রশস্ততর স্থান আরো রয়েছে, পরন্তু যাতে পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর এবং কলেজের একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান ও রসমূর্তিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় সেইদিকেই দৃষ্টি রেখে সম্পাদক-প্রকাশকমণ্ডলী এর পরিচালন কর্মে ব্রতী হয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে অসীম ভাষা-সাহিত্য প্রীতি। তাঁদের অধ্যয়নশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁদের চিত্ত নিতান্ত পরীক্ষা কেন্দ্রিক ক্লান্তিতে নিঃস্ব হয়ে যায় নি। তাঁদের মেধা-বুদ্ধি ও কল্পনা ধাবিত হচ্ছে নব নব উদ্ভাবনী শক্তির দিকে। এই পত্রিকার প্রধানতম লক্ষ্য তাই ছাত্র-তরুণ-চিত্তের সেই স্বাধীন সুন্দর সৃজনশীল বিকাশের পথ কেটে দেওয়া।

ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাঁরা যেন বাংলা ইংরেজি হিন্দী রচনাগুলি কাগজের একপিঠে সুবোধ্য করে লিখে আমাদের সম্পাদক-প্রকাশক মণ্ডলীর অথবা বিভাগীয় প্রধানদের কাছে জমা দেন। রচনা মৌলিক হওয়া চাই এবং কপি রেখে যেন তাঁরা লেখা পাঠান।

রচনার পরিবর্ত্তন পরিমার্জন ও সম্পূর্ণ বাতিল করে দেবার অধিকার সম্পাদক প্রকাশক মণ্ডলীর হাতে থাকবে। দলীয় রাজনীতি বহির্ভূত রচনাই সমাদৃত হবে। পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য পরে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।

* * * *

১৯৭৬ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। শরৎচন্দ্র কেবল গল্পকার হলে তাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপনের পালা এত ব্যাপক না হলেও পারত। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি বাঙ্গালীর জীবনের বিস্তৃত সীমানাকে জুড়ে রয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ সীমান্ত থেকে বিশ শতকের প্রায় মধ্যকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে রবীন্দ্রযুগ শরৎচন্দ্রই একমাত্র সেই যুগের উজ্জ্বলতম লেখক। তিনি রবিকর-প্রভায় আচ্ছন্ন ত ননই, বরং আজো বাঙ্গালীর গভীর-গহন হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-গল্প দুরস্পর্শী। এই তুলনায় কেউই অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হলেন না, কেননা বাংলা সাহিত্যের গল্প সীমানায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই শরৎচন্দ্রের অপরাজেয় আসনটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাস আশ্চর্য ছোট গল্পগুলি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রেরণার বীজ। এই স্বীকৃতি শরৎচন্দ্রের নিজেরই। গীতি কাব্যোচিত কল্পনাশক্তি, ছন্দঝংকার, মহাজাগতিক বিপুল ভারত-ঐতিহ্যবাহী ও সমাজ-জনতা-চৈতন্যসমৃদ্ধ কাব্যসৃষ্টিতে যেমন রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষার সমস্ত শক্তিকে উজাড় করে দিলেন, তেমনই বাঙ্গালীর হৃদয়াস্তি, তার গ্রামপ্রধান সমাজজীবন, বাংলার জাতীয় আন্দোলনের বিচিত্র তরঙ্গোৎক্ষেপ এবং বাংলার নরনারীর মানস সমুদ্রের মণি-মুক্তাকে প্রকাশ করলেন শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ-পত্রাবলীতে, এক কথায় ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্রের পর শরৎচন্দ্রই বোধহয় বাংলা ও বাঙ্গালীর সবসেরা-প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যশিল্পী।

যে কোনো দেশের যে কোনো বড় লেখকই এই নিরক্ষুণ সাহিত্যনিষ্ঠায় সমকালের শিল্পী হয়েও চিরকালের সাহিত্যপথিক হয়ে থাকেন। শরৎচন্দ্রও আছেন। শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক হলেও কেবল নির্জন লেখক নন। তাঁর সৃষ্টি যেমন মঞ্চ চলচ্চিত্র এর মাধ্যমে ব্যাপকতর হয়েছে তেমনই তাঁর সরল, সাধু, স্বচ্ছন্দ অথচ দৃঢ় মানবিক ব্যক্তিত্ব আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে পারে নি। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় স্বদেশী আন্দোলন যুব-সংগঠন থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার প্রান্ত থেকে এই সত্যসন্ধ লেখকের কণ্ঠ স্বদেশী মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে একটি বিলাতি ষ্টীমার কোম্পানীর হঠকারিতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র সত্যিকারের লেখক ছিলেন তাই তাঁর সাহিত্যসাধনা বিচ্ছিন্নতাকামী শিল্প প্রয়াস ছিল না, ছিল দেশের মানুষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

পত্রিকাধ্যক্ষের কলমে

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম মধুমনী কবি বিদায় নিলেন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিজীবন প্রায় ষাট বছরের দীর্ঘ সাধনায় অনলস ছিল। ভবানীপুরস্থ মিত্র স্কুলের বাংলা ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক, সাহিত্যরসিক, দক্ষিণ কলকাতার রসচক্র সাহিত্য সভার মধ্যমণি এই প্রসাদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কবি তাঁর 'সন্ধ্যার কুলায়' থেকে প্রয়ান করেছেন অনন্ত দিগন্তের অস্তাচলে। কবিশেখরের কাব্যগ্রন্থ—পর্ণপুট (১৯১৪) ব্রজবেণু (১৯১৫) বল্লরী (১৯১৫) ও বৈকালীর (১৯৪০) কবিতাগুলি এখনও জনপ্রিয়। তাঁর 'ছাত্রধারা' পড়েনি এমন বাঙ্গালী ছাত্র প্রায় নেই বললেই চলে।" বৈষ্ণব প্রীতিরস পল্লীবাংলার শান্ত মাধুরী প্রেম ও প্রকৃতি" কালিদাস রায়ের কবিতার প্রধান উপজীব্য। প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূল্যায়ণে কবিশেখর বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর ধরে অন্তত পঞ্চাশ জন ঔপন্যাসিক ও গল্পকার বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ-প্রভাবকে উত্তীর্ণ হয়ে নূতন পথ কাটবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এঁরা রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র সমসাময়িক কালের সাহসী তরুণ লেখককুল, যাঁদের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-মুখপত্র ছিল 'সবুজ পত্র' 'প্রগতি' 'কালি কলম' ও 'কল্লোল'—এই যুগেই শৈলজানন্দের আবির্ভাব। তাঁর পাশাপাশি কাছাকাছি লেখকদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, নলীন্দ্র লাল বসু, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি বাংলা সাহিত্যে 'দাদামশায়' বলে খ্যাত) অন্নদাশঙ্কর রায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'কালিকলমে'র সম্পাদক ছিলেন শৈলজানন্দ। এই প্রগতিশীল পত্রিকায় তিনি উপন্যাসের কৃত্রিম ধারার মোড় ঘুরিয়ে আনলেন একটা নতুন সুর। কয়লাকুঠির শ্রমিক-গাঁওতালদের নিষ্প্রভ জীবনকে অঙ্গারের মত উজ্জ্বল ক'রে সেদিন তিনি তুলে দিলেন পাঠকসমাজের হাতে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছিল তাঁর অমিমিশ্র সমবেদনা আর হৃদয়োৎসারী আবেগ। তাঁর 'নারীমেধ' (১৩৩৫) 'বধূবরণ' 'ধুনিয়ারা' 'কয়লাকুঠি' 'মাটির ঘর' 'হাসি' 'লক্ষ্মী' প্রভৃতি অনেক উপন্যাস গল্প বাঙ্গালী পাঠকের কণ্ঠহার হয়ে আছে। বেশ কিছুকাল ধরে অসুস্থতার মধ্যেও তিনি গল্প ভারতীর সম্পাদনা ও লেখালেখি চালিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভাষা-

সাহিত্য-সরস্বতীর কোলেই চিরনিদ্রায় ডুব দিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে ঐ দুজন কবি গল্পকারের অক্ষয় স্মৃতির প্রতি আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

০ ০ ০ ০

'কল্লোলে'র এক সারথি চলে গেলেন। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। সম্পাদক শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশ; সহ-সম্পাদক শ্রীগোকুল চন্দ্র নাগ। "প্রতি সংখ্যা চার আনা। আট পৃষ্ঠা ডিমাই সাইজে ছাপা, প্রায় বারো ফর্মার কাছাকাছি। * * * আমার ব্যাগে দেড় টাকা আর দীনেশের ব্যাগে টাকা দুই —ঠিক করলুম 'কল্লোল' বের করব।" 'কল্লোল যুগ' বইখানিতে অচিন্ত্য কুমার তাঁদের সাহিত্য সাধনা ও আদর্শের অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন। 'কল্লোল' কেবল একটা লেখকগোষ্ঠী তৈরী করে নি, তার ক্ষণজীবন রেখেছিল এক দূরায়ত আলোর স্বাক্ষর, সৃষ্টি করেছিল একটা যুগ। বুদ্ধদেব যথার্থই বলেছেন, 'যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক : সাহিত্য চর্চা) এই বিদ্রোহ সম্পর্কে সেদিন বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যে কতটা সচেতন ছিলেন তা 'শেষের কবিতা' পড়লে বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতই অচিন্ত্য কুমারের সাহিত্য সাধনার সুরু কবিতা দিয়েই, আর '৭৩ সালের এক অপরাহ্নে যেদিন তাঁর কাছে এক সভার আমন্ত্রণ নিয়ে গিয়েছিলাম সেদিনও দেখেছিলাম তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের পরিণত শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বৃত্তটির সমাপ্তি রচনা করছেন কবিতার কলম দিয়ে। তাঁর প্রথম গল্প 'বেদে', সাড়া জাগানো উপন্যাস, এর অকপট ভবঘুরে নায়কের জীবনবেদ রবীন্দ্রনাথকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। এরপর দ্বিতীয় মহাসমরের আগে পর্যন্ত অচিন্ত্য কুমারের কয়েকটি গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়—টুটাফুটা (১৯২৮) আকস্মিক (১৯৩০) কাক জ্যোৎস্না (১৩৩৮) আসমুদ্র (১৯৩৪) প্রাচীর ও প্রান্তর (১৯৩৩) ইন্দ্রাণী, উর্ণনাভ, প্রচ্ছদপট, বিবাহের চেয়ে বড়, ইত্যাদি। এ যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁরই কথায় 'রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।'

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য সাধনার দ্বিতীয় স্তর প্রধানত চল্লিশের দশক থেকে। 'যতন বিবি' (১৩৫১) সারেঙ (১৩৫৪) হাড়ি মুচি ডোম (১৩৫৫) আর 'কাঠ খড় কেরোসিন' গল্পে "তিনি বাঙ্গালী জীবনের যে স্তরকে জেনেছিলেন, তা হল কলকাতা শহরবাসী মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত স্তর। এই সমাজের হতাশা ব্যর্থতা ও দারিদ্র্যের ছবি তাঁর রচনায় বর্ত্তমান।" মাঝে মাঝে কিছু ছোট গল্প ও বিরতির মধ্যেও অচিন্ত্যকুমার প্রায় ষাটের দশক পর্যন্ত লিখে গেছেন; নূতন আঙ্গিকের দিক থেকে চোখে পড়বার মত উপন্যাস—অন্তরঙ্গ ('৫৬) আর

রূপসী রাত্রি ('৫৯)। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ প্রভৃতিদের সাধনধন্য জীবন কথা তাঁর অপূর্ব ভাষাশৈলীতে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য জীবনের আর একটি বিশেষ দিক। বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার অনাড়ম্বর বর্ণবিন্যাসের অভাবে অচিন্ত্যকুমারকে প্রথম শ্রেণীর গল্পকার ঔপন্যাসিকের মর্যাদাদানে কেউ কেউ নাসিকা কুঞ্চন করলেও কবি কথা শিল্পী বিদ্রোহী অচিন্ত্যকুমার তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে আশীর্ব্বাদের জয়টীকা পেয়ে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি।'

কালজয়ী প্রতিভাই একমাত্র বলতে পারে—'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়।'

০ ০ ০ ০

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বোধহয় 'সাহিত্য' শব্দটিকে নিতান্ত মানব-ভাষার লেখ্যরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। সহিতত্ব সংযোগ বা 'কমিউনিকেশন' এসব দিক থেকে পাঠ্যগ্রন্থ বা ভাষা-অক্ষর-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে সঙ্গীত এবং নাটকও—এবং আধুনিক কালের চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদিও। পঞ্চাশের দশক থেকে আমাদের ভাষার চলচ্চিত্র বা সিনেমায় নিতান্ত চাক্ষুষ ক্ষণিক আনন্দকে খানিকটা স্থায়ী শিল্প সৃষ্টির মর্যাদায় উন্নীত করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিক থেকে প্রথম সারির সিনেমা পরিচালকদের মধ্যে ঋত্বিক ঘটকের নাম করা হয়ে থাকে। তাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গালীর শিল্প সংস্কৃতির অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেল। কেন না তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু আমাদের পাবার ছিল। 'অযান্ত্রিক' 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'সুবর্ণ রেখা'র ঋত্বিক ঘটককে আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। শোনা যাচ্ছে তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গল্প' শীঘ্রই মুক্তি পাবে। যাঁরা তাঁর আগের ছবিগুলি দেখেছেন, বিশেষ 'অযান্ত্রিক' ও 'সুবর্ণরেখা' তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে গল্প চরিত্র আর ক্যামেরার আশ্চর্য সমন্বয়ে ঋত্বিকের সৎশিল্প প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অবদান। তাঁরা 'জ্বালা' নাটকটি বেতারে ও মঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। বক্তব্যবিষয়ের বলিষ্ঠ উপস্থাপনায় ঋত্বিক ছিলেন প্রগতিশীল বৈপ্লবিক নাট্যকার শিল্পী সমাজের অগ্রদূত। দুঃখ বেদনা নৈরাশ্য ব্যাধি ও মৃত্যুর ব্যক্তিগত ঋণ চুকিয়ে দিয়ে তিনি সাত্ত্বিক ঋত্বিকের মতই মহাকাল ও ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন।

শরৎচন্দ্র, কবিশেখর কালিদাস রায়, শৈলজানন্দ ও অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে উৎসাহী ছাত্ররা নিম্নলিখিত বইগুলি দেখতে পারে—

১। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মডার্ণ বুক এজেন্সী—(আধুনিক যুগ)।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন (আধুনিক যুগ)।

৩। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।

৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। শরৎচন্দ্র—সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত।

৬। গল্পকার শরৎচন্দ্র—সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। কল্লোলের কাল—জীবেন্দ্র সিংহ রায়।

৮। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য—গোপিকানাথ রায় চৌধুরী।

৯। চতুষ্কোণ—শরৎ চন্দ্র জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা।

১০। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আশা করি কিছু আলোচনা বেরোবে।

সভাপতি যা ভাবেন

অধ্যাপক অজয় কুমার সেন

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরিকল্পনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আমার মনে হয় যে শিক্ষাক্ষেত্রের মূল কাঠামোটা দেশ গঠন ও ব্যক্তিত্ব গঠনের উপর নির্ভর করা উচিত। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে দেশ গঠনের কথাটা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে জাগে। প্রাথমিক স্তর ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য-সূচীর মধ্যে জাতীয় আন্দোলন, জাতির বীরত্বের ইতিহাস, কৃষিকাজে আমাদের চাষী-ভাইদের কথা, শিল্পক্ষেত্রে মজুর ভাইদের কথা জানাতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। অর্থাৎ দেশ গঠনের কাজে যাঁরা যে ক্ষেত্রে সাহায্য করছেন তাঁদের কথা পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে শ্রমের আদর্শ আশ্রমের আদর্শ। মাথাভারী পুঁথিগত শিক্ষা নয়। সৃজনশীল বাস্তবশিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষাকে করতে হবে সর্বব্যাপক, আবশ্যিক ও সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক। পল্লী গ্রামের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে কৃষি বিদ্যালয় ও কারিগরী বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে শিক্ষার পরে কলেজে গিয়ে ভীড় না বাড়িয়ে নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করে নিতে পারে। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ এই শ্রমকেন্দ্রিক উৎপাদনশীল বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলেছেন।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে হাতে কাজ শেখানোর উপর লক্ষ্য দেওয়া উচিত। কারণ দেশগঠনের কাজে ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দক্ষ কারিগরেরও প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যবহারিক কাজে ইঞ্জিনীয়ারের থেকে হাতে কলমে কাজ জানা দক্ষ কারিগর বেশী জানে বা বোঝে। হয়ত গ্রন্থব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ বা পদ্ধতি সে গুছিয়ে বলতে পারবে না।

স্বাধীনতার ২৭ বৎসর পরেও দেখা গেছে যে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে। দেশবাসীর সাক্ষরতা ব্যতিরেকে দেশ গঠন ও জাতীয় চরিত্র গঠন অসম্ভব। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ২৯'৪৫ শতাংশ মানুষ সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এরমধ্যে পুরুষ শতকরা ৩৯'৫ জন ও মহিলা শতকরা ১৮'৭— এরমধ্যে সাক্ষরতায় ষষ্ঠ স্থানাধিকারী পশ্চিমবঙ্গের হিসাব ৩২'২ শতাংশ।

অনেক ছাত্র হয়ত জানে না যে তাদের কলেজীয় শিক্ষার জন্য সরকারকে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। এবং ঐ টাকা সরকারের তহবিলে আসে দেশের দরিদ্র চাষী-মজুরের দেওয়া ট্যাক্স থেকে। অতএব কলেজের ছাত্রদের মনে রাখতে হবে যে তাদের কলেজে শিক্ষার জন্য জনসাধারণের অর্থ খরচ করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত দরিদ্র দেশবাসীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা এবং আমার মনে হয় তাদের দেশগঠনের প্রথম কাজ হবে নিরক্ষর, দরিদ্র দেশবাসীকে সাক্ষর করে তোলা। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে বৎসরে ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করতে হবে।

আমরা যে সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষার কথা বলে শহরে হৈ চৈ করি, উচ্চ বিদ্যায়তন গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে আলোকিত সম্মেলনের গৌরবে গৌরবান্বিত ও আন্তর্জাতিক সমারোহে পুলকিত হই তখন কি আমরা একবারও মনে রাখি যে দেশের একটা বৃহৎ অংশ, ভারতের মূল জীবন প্রবাহের প্রায় পনের আনা ভাগ ধুঁকছে অশিক্ষা অক্ষরজ্ঞানহীন অন্ধকারের দুর্দশায়। তাই মেহনতী জনতার নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাকে উৎপাদনশীল শ্রমকেন্দ্রিক ও সৃজনধর্মী এবং জীবন পরিপার্শ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উপযোগী করে নূতন করে ঢেলে সাজাই হবে — বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাসূচীর প্রধান লক্ষ্য।

এই "নিষ্ফল", বাগাড়ম্বরপুর্ণ, পুঁথিভারাক্রান্ত স্রোতরুদ্ধ শিক্ষার বন্দীদশা মোচনই হবে আজ দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাবিদ ও ছাত্রসমাজের জীবনের মূলব্রত।

আমার কথা

ওদের কথা ফেলতে পারলাম না। এতদিন ছাত্রদের সঙ্গে থেকে কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য লড়ে এসেছি তাই ওদের দাবী অনুযায়ী কলেজ জীবন শেষ হলেও আবার অন্য বিভাগে এক বছর থাকতেই হ'লো।

বিভিন্ন কারণে ছাত্র সংসদে ছোট ছোট রাজনৈতিক সংঘাত—যার ফলে কলেজের উন্নতি ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এ বছর সেদিকে বেশী সময় দিয়ে যতটা আমার পক্ষে সম্ভব তা মিটিয়ে দিয়েছি।

কলেজের সামগ্রিক উন্নতি অব্যাহত রাখতে ছাত্র সংসদকে কর্মঠ রাখতে কলেজের শিক্ষকদের ভূমিকা হতাশাব্যঞ্জক। ছাত্ররা এগিয়ে এসে তাদের নানা অসুবিধের কথা না বললে ছাত্র সংসদের একার পক্ষে সব মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আশা রাখি ছাত্ররা ছাত্র সংসদকে চাপ সৃষ্টি করে ফলনশীল কাজ আদায় করতে পারবেন।

ছাত্র সংসদ গঠন অনেক দেরীতে হয়েছে। বিভাগীয় সম্পাদকরা বলতে পারবেন এই সময়ের মধ্যে তাদের দপ্তর কতটুকু ছাত্রদের সাহায্য করতে পেরেছে।

আমার মতে এবারের সংসদের নেতৃত্বে যারা তারা সবাই নবীন সেই তুলনায় সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে—কাজ মোটামুটি ভাল।

তবে ছোট ছোট অনেক দাবী ছাত্রদের আছে তার দিকে অবিলম্বে ছাত্র সংসদকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সকল ছাত্রকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শুভেচ্ছান্তে—
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
কার্যকরী সভাপতি,
আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

একটানা রাজনৈতিক অশান্তি আর ঝামেলার মধ্যেই ১৯৭৪-৭৫ সালের 'ছাত্র সংসদের' নতুন করে জন্ম। তার সমস্ত গুরুদায়িত্ব আমার ওপরই দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এই বিশাল দায়িত্ব নিতে কারণ প্রথমতঃ বছরের মাঝামাঝি দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ অশান্তি চলাকালিন এবং তৃতীয়তঃ এত বড় কলেজের যার ছাত্র সংখ্যা অন্যান্য কলেজের তুলনায় অনেক বেশী।

যাহোক পার্থদার (পার্থ চট্টোপাধ্যায়) পূর্ণ সহযোগীতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে একটু সময় লেগেছিল আর তা ছাড়া বিগত দিনে মানে আমার আগে পার্থদা স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বলতে গর্ব হয় এবং হলফ করে বলতে পারি উনি যত দিন নেতৃত্ব দিয়েছেন ততদিনই ছিল আশুতোষ কলেজের স্বর্ণ যুগ এবং আশুতোষ কলেজের পুরাণো স্মৃতি ও মর্যাদা দীর্ঘদিন পরে প্রতিষ্ঠিত করার একটিমাত্র অধিকারিই স্বয়ং পার্থ চ্যাটার্জী। তাই, এইসব চিন্তা করে আরো বেশী যাবড়ে গিয়েছিলাম।

কার্যভার মাথায় নিয়েই প্রয়োজন বোধ করেছিলাম কলেজকে অশান্তি মুক্ত করতে এবং প্রকৃত বিদ্যার পীঠস্থান গড়ে তুলতে। বলতে লজ্জা বোধ করি না আমার কাজে আমি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিলাম অবশ্যই কলেজের প্রত্যেক ছাত্র-শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী মণ্ডলির পূর্ণ সমর্থনের জন্য। অন্যান্য কাজের মধ্যে নবীন বরণ উৎসব, খেলা-ধূলা, সাংস্কৃতিক আসর এবং "ইনডোর গেম্‌স" প্রভৃতি মোটামুটি ভাবেই করতে পেরেছি। আরো কলেজের উন্নতির যেমন, লাইব্রেরী ক্যান্টিন ও বোটানির অনার্স' প্রভৃতি আরো ভালোভাবে এবং চালু করার প্রস্তাব শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষের কাছে রেখেছি এবং প্রতিশ্রুতিও পেয়েছি। আরো একটি বিষয় গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি কারণ এটা আশুতোষ কলেজের নামে একটা বিরাট কলঙ্ক এবং যা অনেকদিন যাবৎ দৃষ্টিকটু ছিল তা হোল আশুতোষ কলেজ "টেন্ট"। এটাকে পুরোপুরি নতুন করে রূপ দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি, তবে এর জন্য সবচেয়ে যার সাহায্য পেয়েছি তা হোল আমার বন্ধু ও সহকর্মী প্রণব মুখার্জীর।

বিদায় প্রসঙ্গে অভিনন্দন জানাই অধ্যক্ষকে, যিনি বিশাল বৃক্ষের ছায়ার মত স্নেহ ও আশির্বাদ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন; প্রত্যেক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী এবং

আমার সহকর্মী বন্ধুদের ও ছাত্রবন্ধুদের। এ বছর সমস্ত দায়িত্ব বন্ধু পল্টুর ঘাড়েই দিয়ে চলে এসেছি, আশা করি আপনারা প্রত্যেকে নিজের মত মনে করে কলেজকে আরো অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর বিশ্বাস রাখি বর্তমান প্রতিশ্রুতি 'ছাত্র সংসদের' প্রত্যেক কর্মীবন্ধুদের উপর কারণ প্রত্যেকের উপর একটা আলাদা বিশ্বাস এবং কিছুটা ওদের নতুন করে গড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম যা সময়ের তুলনায় অনেক কম কিন্তু ঐ টুকুন সময়ের মধ্যেই ওরা নিজেদের স্বচ্ছ এবং বিশুদ্ধ ইস্পাতে পরিণত করতে পেরেছে'।

বন্দে মাতরম্। জয় হিন্দ।

অঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

কবিতা গুচ্ছ

রূপ ও অরূপ

আশিস সেন
পি, ইউ, বিজ্ঞান।

পাথরের বুক ফাটিয়ে
শিল্পী গড়তে চায় কিছু
আপন বুকের রক্তে
কল্পনার অনুরাগে
ভিজিয়ে ভিজিয়ে
এনে দেয় পাষাণে
প্রাণ,—
কঠিন রুক্ষতার মাঝে
সূক্ষ্মতার টান।
পাথর আর পাথর নয়,
খোদাই করা,
সজীব এক ভঙ্গী
দূর হতে হাতছানি দিয়ে
কাছে ডাকে
শুধু বলে আমায় দেখ,
অপলকে চেয়ে থেকো না।
আমি দেখি শুধু
ষ্ট্যাচু

বলি কি চাও তুমি?
কতদিন বাঁচতে চাও?
অনন্ত জীবন আমার
ফসিল্ হয়েও থাকতে চাই
সৃষ্টির ভাঙ্গা গড়া নিয়ে।
যে গড়েছে আমায়
অনুরাগ দিয়ে।
তার অমৃতের স্বাক্ষর
বুকে লিখে নিয়ে।

অমরত্ব

শিশির সরকার
প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় : বিজ্ঞান।

শাজাহান—
না, না, না
অমরত্ব চাহিনা লভিতে আমি।
ধ্বংস কর
আমারই আদেশে
গড়া এ তাজেরে।
আমি আর পারি না
বহিতে এ যন্ত্রণা,
দীর্ঘ কাল ধ'রে।
এমন কি কেহ নাই
ধরণী মাঝারে
যে পারে ধ্বংসিতে
মম প্রাণের তাজেরে !!

বিবেক—
আছে, আছে
সাধিতে তোমার সাধ
আছে সে মানব
ধরিত্রী মাঝারে।

শাজাহান—
কে? কে?
কে তুমি? তুমি কে!
শাজাহান প্রশ্নের
দাওহে উত্তর।

বিবেক—
আমি বিবেক
আমি সত্য
আমি অবিনশ্বর।
আমি আছি
আমি ছিলাম
আমি থাকব।
আমি যে সর্বকালের
আমি নাহি
পড়ি চাপা
মিথ্যা আবরণে।
কি হ'লো?
কি হ'লো সম্রাট?
নীরব কি হেতু?
কিছুক্ষণ আগে
ধ্বংসিতে চাহিতেছিলে
আপন আদেশে গড়া
সাধের তাজেরে।
কিন্তু কেন? কেন?
তুমিতো চাহিয়াছিলে
অমরত্ব
মমতাজ উপলক্ষ্য শুধু
চেয়েছিলে দৃপ্ত হ'ক
শাজাহান নাম,
অমর অক্ষরে লেখা থাক্
পাষাণ শিলার বক্ষে
অম্লান ভাষায়।

শাজাহান—
শোন, শোন হে বিবেক
আমি আজি সর্বকথা
তোমার কাছেতে
করিয়া উজাড় জুড়াইব
হৃদয়ের জ্বালা।
প্রেমের পূজারী
নরনারী
যমুনার তীরে আসি
শান্ত শুচি পবিত্র অন্তরে
বিস্মিত দু'চোখ মেলি দেখে
আমার আদেশে
গড়া আমার এ শ্রেষ্ঠ
কীর্তিধ্বজা।
আবেগ আকুল কণ্ঠে
করে মোর প্রেমের তুলনা
কর্ণে মোর সুধা বর্ষে যেন।
কিন্তু যবে অন্তরের ভাষা খুঁজে
সত্য যাহা করে উদ্‌ঘাটন।
বলে, মিথ্যা দিয়ে
হাহাকার দিয়ে
গড়া এই তাজ
শুভ্রতার মাঝে
খোঁজে কলঙ্ক কালিমা
কণ্টকিত হই আমি।
প্রিয়ার স্মৃতির নামে
আপনার অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত
করিবার লাগি মোর
ছিল এ প্রয়াস
মিথ্যা নাই এতটুকু তায়।

মনে পড়ে—
সহস্র প্রিয়ার হাসি
কান্নিয়াছি আমি
মনে হয় চীৎকার করিয়া বলি
অভিনয় শুধু অভিনয়,
মিথ্যার পাহাড়ে গড়া
এ সৌধ আমার,
ধ্বংস কর, লীন কর একে,
প্রেম নাই, আছে শুধু
মিথ্যা গর্ব আত্ম অহংকার
সে গর্ব বিচূর্ণ করি'
পার যদি কেহ তবে মিশাও
ধুলার তলে প্রেমের কীর্তির এই
উদ্ধত শিখর।
মুছে দাও শাজাহান নাম।

বিবেক—
তাতে কি পড়িবে চাপা
ছলনার চাতুরী তোমার ?
ধ্বংসস্তূপ ঠেলি দীর্ঘশ্বাস
কান্নায় স্খলিত কণ্ঠে
চিরদিন করিবে প্রচার
অপকীর্তি তব।
জানিবে জগৎজন
শৃঙ্খলিত বন্দী প্রেম
অবরুদ্ধ পাষাণ
প্রাচীরে
গুমরিয়া অব্যক্ত
ব্যথায়
কবে গেছে মরে।
আছে শুধু নীরস
পাষাণ বেদী
আর আছে প্রেমলেশহীন
এই প্রাণহীন
দেহ শাজাহান !!

ধূসর অপরাহ্ন

দেবাশিস মজুমদার
দ্বিতীয় বর্ষ : কলা বিভাগ
অনার্স : বাংলা

যেতে চেয়েছিলে তুমি এই নির্বাণের সংসারে এসে
শব্দেরা যেখানে দুরন্ত বাসনার মতো ক্রীড়ায় রত
কিম্বা কোন মানসপুত্রের নির্লোভ স্ব তোৎসার উৎপাদিত হয়ে
ঋণী তুমি সেই ধূসর অপরাহ্নের কাছে।
রিণ রিণে ব্যথা গোটা বুক ছেয়ে ফেলেছে
পিদিমের কোমল আলোয় প্রবীণার পাঁচালীর সুর
অস্তে তাই শুধু কাননবালার মতো বিস্ময় জমে থাকে।

ফসলের পিছুটান।

এখনও কিছু শব্দ আছে যার ফেরে মানব মায়া মরীচিকা
সিক্ত যূথীর বেদন ঢালা।
যৌবনের কাছে ভিক্ষুক হয়ে বেঁচে থাকা কোন সাহসের কথা নয়।
ফেলে আসি তাই ভূষিত জীবনকল্প, বাগানবাড়ি
সাধের পথ,
ঘিরেছে কারা। এরা কি কোনো ছায়া
অথবা হেমন্ত ঋতুর সংগোপনে ফেলে আসা
অগণিত ফসলের পিছুটান।

ছন্দোবদ্ধ : ১

শীতলসীর অবগাহক সান্নিধ্য সন্ধান
কেবল শুধুই ভরাট দিবস জটিলতার দান।
প্রাণসখা তুমিও ছিলে মত্ত দিনে ঐ নীলিমায়
এবং ছিল অষ্ট প্রহর অপার গরিমায়।
মনস্ক প্রায় হেমন্ত দিন উদাস উদাস সাড়া
সঠিক ভাবেই যদিও ছিল সুখকে নিয়ে নাড়া।

ছন্দোবদ্ধ : ২

যেহেতু কোন স্পষ্টতা নেই মনস্কতায় অন্যথা
চিত্ত বাদল মোর তামসী বেদনভরা যথা
নিঃশেষে প্রাণ দগ্ধ চকোর মুঠোয় থাকে দুঃখ
তুষ্টবারিক নদী মুখীন জড়িয়ে রাখে বক্ষ
প্রাপ্তি স্বীকার ভিন্নশরিক অবস্থিতি মিত্র
লিপ্ত শুধুই লিপ্ত বাতাস হয়নাতো তাই সিক্ত।

আঙ্গিক

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ : কলা বিভাগ
অনার্স—ইংরাজি

নীল আকাশে তারার মালা,
শুভ্রলোকে আলোর বীণা
ঝঙ্কৃত সুর গড়ায় কেন ?
কে দিয়েছে সোনার ডালা।

পলাশ ফুলের মধুর রঙে ;
কে সাজাল ঐ বাগিচা ?
পদ্মরাগের শুভ্র হাসির
কোন্ ভুবনের ঐ নিশানা।

কে বলেছে সুর দিতে আজ
সন্ত্রমে ঐ আলোর দলে,
কুসুম-প্রভাত কে ছড়াল
মল্লিকারই মৃদুল তালে।

রক্ত রাজ রবির গায়ে,
আলপনা ঐ কে এঁকেছে ?
পুণ্য-প্রভাত ছড়িয়ে পড়ে ;
প্রকৃতির ঐ আঙ্গিকেতে।

কোয়েল

প্রণব ভট্টাচার্য
প্রথম বর্ষ : বিজ্ঞান

তখনও নির্মেঘ আকাশ তার
নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলে
ঢাকেনি সাঁঝের সূর্যকে
সফেন তটরেখা কেঁপে কেঁপে
ওঠে, কোয়েলের কোয়েলিয়া তানে
যখন চলেছি কোয়েলের চরে।
বুনো শাল সোঁদা গন্ধ
উপহার দেয়, বাতাস
বয়ে আনে তাকে
নির্ব্বাক মৈনাক হয়ে দেখি
উষ্ণ ক্ষুব্ধ কোয়েলের ঢেউ
সাঁঝের ইশারা দেয় উড়ন্ত বক ॥
সাঁঝের সন্ধ্যা-তারা আর
আমি পাশাপাশি হাঁটি
তোমার চুলের ঘ্রাণ নিয়ে
কোয়েল, কোয়েলিকা তানে
বুকে তোলে ব্যথার পুরবী রাগ
রাতের ইশারা দেয় একফালি চাঁদ ॥

এক বর্ষণ মুখর রাতে

অভিজিৎ দাস
দ্বিতীয় বর্ষ : কলা বিভাগ
অনার্স : বাংলা

এক বর্ষণমুখর রাতে, আমি
বিছানায় শুয়ে আছি, সামনে
পিছনে, এধারে ওধারে, কেউ নেই।
অন্ধকার, নিস্তব্ধ!

বাইরে টুপ-টাপ্ বৃষ্টির শব্দ ;
মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছে।
পৃথিবী এ মুহূর্ত্তে ভীষণ ভয়ঙ্কর মনে হলো।
যেন রাত্রির নিস্তব্ধতা আমায়
গিলতে আসছে।

এমন সময়—
দরজায় কট্ কট্ শব্দ :
কে? কে? আগন্তুক নিরুত্তর।

ভয়ে দু'পা পিছিয়ে আসি। এবার বুকে সাহস নিয়ে
সজোরে দরজা খুলে দেখি—

একটা ধেড়ে ইঁদুর এধার থেকে ওধারে ছুটে পালালো।
ইঁদুর!
এমন ভয়ঙ্কর বিপন্ন রাতে
শুধু ইঁদুরের ভয়েই—

সমাজ সেবায় কয়েকটা বছর

তড়িৎ কুমার দত্ত

প্রাক্তন ছাত্র

দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল। ১৯৭২ সালে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ অজয় কুমার সেন এর নেতৃত্বে কলেজে জাতীয় সেবা প্রকল্পের ইউনিট আনুষ্ঠানিকভাবে খোলার অব্যবহিত পরেই সামাজিক চেতনাসম্পন্ন একজন স্বেচ্ছাকর্মীরূপে প্রকল্পে যোগ দিই। সেই থেকেই আজ পর্যন্ত জাতীয় সেবা প্রকল্পের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছি। এরই মধ্যে তিন-তিনটে বছর কেটে গেছে সমাজ সেবার কাজে। চতুর্থ বছরও প্রায় শেষ হয় হয়। কখন কি ভাবে যে এতগুলো বছর কেটে গেল টেরই পেলাম না। ভাবতেও অবাক লাগে।

সমাজ সেবা করতে গিয়ে এই কয়েক বছরে নানান ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি আমার মত সাধারণ ছাত্রদের সমাজ-সেবার কাজে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখে। আমাদের দেশে ছাত্র সমাজ একটা বিভীষিকা। "ধ্বংসাত্মক কাজেই ছাত্রদের আনন্দ"—এ রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা আজও কিছু লোকের মধ্যে আছে। কিন্তু সমাজ-সেবার কাজেও যে আমাদের ছাত্ররা পিছিয়ে নেই আর। অন্যান্য উন্নত দেশের ছাত্রদের মত আমাদের ছাত্ররাও আজ গঠনমূলক কাজে এগিয়ে এসেছেন এটা বোধ করি অনেকেই জানেন।

সমাজের উন্নয়নের জন্য ছাত্রদের কি অমানুষিক পরিশ্রম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একটার পর একটা প্রকল্প হাতে নিয়ে দিন রাত প্রচণ্ড পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণ করে ছাত্রেরা নিজেরা যেমন আনন্দ পান, স্থানীয় লোকদের তেমনি আনন্দ দেন। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক পাতিয়ে একযোগে নেমে পড়েন নানান ধরণের সেবামূলক কাজে। আর গ্রামাঞ্চলে শহরের ট্রেলেন, টেরিকটন পরা সদাচঞ্চল ছাত্রেরা গ্রামের মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। এ দৃশ্য দেখতেও ভালো লাগে, আনন্দও লাগে।

অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরণের কাজে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন কলেজের অধ্যক্ষ এবং জাতীয় সেবা প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ।

আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যেভাবে আমাদের সাহায্য করেন তা তুলনাহীন। আমরা যখনই তাঁর কাছে যাই, তিনি শতকাজ ফেলে রেখে আমাদের সাড়া দেন। অনেক সময় তিনিই আমাদের বিভিন্ন ধরণের কাজ করার পরামর্শ দেন। আর আমাদের অধ্যাপক ডাঃ অজয় কুমার সেন এর কথা বলা মানেই তাঁকে ছোট করা। তিনি যদিও জাতীয় সেবা প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, তবুও তিনি নিজেকে শুধুমাত্র জাতীয় সেবা প্রকল্পের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি। ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন স্থানে। তাঁর মত ছাত্রদরদী, কর্মব্যস্ত অধ্যাপক পেয়ে সত্যিই আমরা নিজেরা খুব উৎসাহিত হই। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা বলা না হলে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। তিনি হচ্ছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সেবা প্রকল্পের অনুষ্ঠান সংযোজক অধ্যাপক সলিল কুমার ব্যানার্জী। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করেছে। তিনি বারংবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আমাদের সেবামূলক কাজে উৎসাহিত করেছেন।

১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে আমরা মাত্র পঞ্চাশজন ছাত্র স্বেচ্ছাকর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু করি। ঐ বৎসর আমরা যে সমস্ত কাজ করেছি তার মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক কলেজ ছাত্রাবাসে একখানি পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার উদ্বোধন, ছাত্রাবাসে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, ৪৬, কালীঘাট রোডে একটি বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, কালীঘাট কালীমন্দিরে পৌষ সংক্রান্তি এবং শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পুন্যার্থীদের সহায়তা করা, রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতালে রোগীদের সহায়তা করা, বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ, বিভিন্ন বস্তীতে সমাজ-সেবা, স্বাস্থ্য ও খেলাধূলা সম্পর্কিত চলচিত্র প্রদর্শন, 'ষ্টুডেণ্টস্ হেল্‌থ হোম্' এর উন্নয়নকল্পে পরিপুর্ণ জীবনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রায় যোগদান করা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউটের (গ্রাম সেবক কেন্দ্র) সহায়তায় দক্ষিণ কুমড়াখালি গ্রামে শিবির স্থাপন করে রাস্তা তৈরী করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদের নিকট হতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। ফলে স্বেচ্ছাকর্মীর সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ তে বাড়ানো হয়। ঐ বৎসর আমরা যে সমস্ত কাজ করেছিলাম তারমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন বস্তীতে প্রায় দু হাজার বস্তীবাসীকে বসন্তের টিকা দান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালনা, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা, দক্ষিণ ২৪-পরগণার বোড়াল গ্রামে কলেরার ইনজেকশান দেওয়া, চক্ষু-দান প্রচার অভিযান, বর্ধমান জেলার আখলপুর গ্রামে ১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ রাস্তা তৈরী করা এবং ঐ গ্রামেই চাষীদের চাষের সুবিধার জন্য খাল কাটা প্রভৃতি।

ছাত্রদের এই সমস্ত গঠনমূলক কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যেও জাতীয় সেবা প্রকল্পে যোগদানের আগ্রহ দেখা যায়। সুতরাং ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে স্বেচ্ছাকর্মী সংখ্যা ১০০ থেকে ২০০তে বাড়ানো হয়। অন্যান্য কাজের মধ্যে এ বৎসর আমরা প্রায় ২৫০০ বস্তীবাসীকে টিকা দিয়েছি, আই, এস, এ'র ৫০তম অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের দায়ীত্বে ছিলাম, বন্যার্ত ত্রাণে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা এবং রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডিয়া'র অনুরোধক্রমে দুঃস্থদের ট্রেনিং সেণ্টার স্থাপনের জন্য নাথেরবাগান স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কিছু কাজ করেছি।

এ বৎসরও আমরা বিভিন্ন ধরণের কাজ করেছি। যেমন রক্ত দান, রোগ এবং অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে দীঘার সন্নিকটে সাতমাইল গ্রামে শিবির স্থাপন, বর্ধমান জেলার আখলপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করে সেখানে নির্মিয়মান একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন তৈরী, এবং বন্যাদুর্গত পাটনাবাসীদের ত্রাণের জন্য কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় অর্থ সংগ্রহ এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান প্রভৃতি।

আমি আশা করি এ বৎসর আমরা আরও দক্ষতার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে এবং একাগ্রতার সঙ্গে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পারব।

সবশেষে আমি জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রতিটি স্বেচ্ছাকর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এই লেখা প্রকাশে সাহায্য করার জন্য শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রণব মুখোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রীচট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমুখোপাধ্যায় জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে ছাত্র সংসদের তরফ থেকে নানা ভাবে সহযোগিতা করে থাকেন।

জয় হিন্দ্ !!

Rural Indebtedness

Pronab Kumar Mukherjee
3rd Year B.Sc.

To-day our country is the sixth member of the nuclear club and the eleventh member of the space club. She has been making tremendous progress in the fields of science and technology in her twenty eight years of independence. Her success in nuclear implosion and in sending artificial satellite 'Aryabhata' in the space makes other countries envious. Some of them even stopped their aid to India out of rage. They got stunned to think how a poverty striken India could afford such costly enterprises.

To-day one can regard India as a unini power. She is in her way to all-round progress. But her agriculture remains more or less stagnant contrasted with her progress in other spheres.

There is no denying the fact that after two hundreds years exploitation by the British Imperialists, to-day India has raised her head in the international fields. Her voice is now echoed in different intetnational affairs. She has made immense contribution to the cause of World Peace.

I am proud that I am an inhabitant of this country But my pride fades away when I cast my look to the villages. Our country is predominantly agricultural, her agriculture contributes 50% of our national income and is the largest employer of the country. But still our villagers can hardly get a square meal, still over 60% people live below the poverty line.

So called Democracy, Socialism, Planning, Social justice, etc. have little meaning to these persons. The plight of them is appalling.

I have already said that India is a country where agriculture forms the backbone of the economy. A vast majority of the people are tied to

the soil for at least two reasons ; firstly, people must work on the land if they are to survive and secondly, there is very little scope for alternative employments. Therefore, all the members of a peasant family huddle together on a small plot of land and jointly consume whatever they produce ; the share of each is very small, not enough for subsistence.

Moreover the Indian farmers are ignorant, illiterate, superstitious, conservative fatalists and bound by out-moded customs. Their sole dependence on the vagaries of monsoon and primitive method and techniques of production result in low productivity, Besides, there is no provision for financing the poor farmers for increasing their production. Thus all these factors have conspired together to wreck the lives of the farmers. Then for existence they have to depend on village money lenders and have to pay very high rates of interests so high that once a farmer has borrowed, he is bonnd to lose his land and becomes a landless labour.

The poverty afflicted farmers borrows from money lenders year after year. But he is not able to pay off his debt. In this way the process of borrowing continues and the farmer gradually sinks into debt. His acute poverty leads him to borrowing which causes indebtedness. There are so peculiarities of Indian farmers. Though they have no money, they resort to certain types of conspicuous consumptions which lead them to indebtedness.

Births, deaths and marriages, harvest seasons worships of Gods and other religious rites become occasion for extravagance. How pitiable the condition of our farmer is ! Even after his father s death, the son has to bear the burden of his father's debt, just as the son inherits his father's property. They consider it a sacred duty to pay off his father's debts.

The village money-lender plays the role of a villain in Indian agricultures. He encourages the poor farmer to borrow more and more only to grab his land. He forces the farmers to sell their produce to him

during the harvest time at low prices and make the farmers buy their produce at exorbitant prices during the lean period. Thus the dominant feature of the problems of rural indebtedness emerges from the activities of the village money-lenders who thrive mainly by capitalizing on the perpetual poverty of the farmers.

Indebtedness is so associated with the life of the farmers that it is not easy to get rid of it. There unfortunate farmers are born in debt and stay in debts all their lives. It has almost been a saying that the Indian farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt.

But things are now changed a lot. The days of money lenders are numbered. Strict measures have been taken to rescue the poor farmers from the clutches of the Greedy and cunning money lenders, It seems that the farmers are no longer to live in lifelong indebtedness. They have been set free since June 26 1975. On that day our respected Prime Minister proclaimed emergency to protect the interests of the down-troden and the most valuable section of our society.

Another epoch making thing cf the year is the announcement of the 20 point new economic programme by our prime minister. The basic aim of this programme is to ameliorate the lot of these poor farmers. So long they have been denied adequate finance for their profession. Their deplorable plight figures in the manufestoes and speeches of almost all political parties who shed crocodile tears for their destitution, but more is able even to suggest a measure which can mitigate their sufferings, they rather try to exploit these poor fellows in their political propaganda.

But on 1st July, 1975, come out a pakage of new economic programme which deals very sympathetically with farmers, artisans labourers and other poor sections of the community. She said, "The vast" majority of our people live in the rural areas we must implement ceiling laws and distribute surplus land among the landless with redoubled zeal.

"The programme of providing house sites in the rural areas, will be vastly expanded, Laws will be introduced to confer ownership rights on the landless labourers who have been in occupation of house sites of their landlords over a certain period. Resort to eviction will be sternly dealt with.

'The practice of bonded labour is barbarous and will be abolished".

She further added, "we propose to take action by stages to liquidate rural indebtedness, while new schemes will be drawn up to denise alternative agencies to provide institutional credit to landless labourers, rural artisans, small and marginal farmers who own less than two rectores, there will be a moratorium on suits and execution of decrees for the recovery of debts from such groups.

Agricultutal labour is among the woust exploited sections of our Society. A review of existing legislation of uninimerer wages for agricultural labour will be undertaken and action will be initiated for suitable enhariement of minimum wages wherever necessary '.

But the problem posed by rural indebtedness can not be done away with in a day. Moreover, our farmers we allustomed to such practices. They think it better to go to money lender than to the credit institution which have been established since the days of bank nationalisation. One of the basic aims of bank nationalisation is to provide easy credit and other agricultural inputs to the farmers, But the farmers fear to go to the banks. This is largely due to their ignorance and illiteracy.

So to make our country strong and prosperous and to make the lives of these millions of people meaning ful, we must have to work together with our Government, leaving all parochial feelings and prejudices behind. The co operation of people in all walks of life will usher is a new down in the gloomy lives of our farmers.

আমাদের প্রতিবেশী—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা

—অধ্যাপক শ্রীকান্তীশ চন্দ্র মাইতি

" * * * * * শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি, নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো।"

কি অপূর্ব্ব কবিকল্পনা। পৃথিবীর সংগে আকাশের জ্যোতিকের যে নিবট আত্মীয়তা ভাবে, ভাষায়, গানে ও চিত্রে রূপায়িত হয় কবির কাব্যে, গায়কের কণ্ঠে, শিল্পির তুলিতে—সর্বোপরি মানবের হৃদয়তন্ত্রীতে—তার বুঝি তুলনা নেই। তাই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আকাশের এক অজানা রহস্য হাতছানি দিয়ে ডাকে আমাদের। আসুন, সেই অযুত আলোকে ঝলকিত নীলগগনের সংগে কিছু পরিচিতি লাভ করা যাক্।

রাত্রির অন্ধকার যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে, তখন একদিন মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকান্—যদি শীতকাল হয় তবে তো কথাই নেই। দেখুন কি অপরূপ রূপরাশি নিয়ে অনন্ত আকাশ আপনাকে কাছে টানে ও আপনাকে মুগ্ধ করে। দেখবেন্ শত শত নক্ষত্র মিটিমিটি জলছে—তার মধ্যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আবার কতকগুলি ক্ষীণপ্রভ। কতকগুলিকে মনে হবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—আবার কতকগুলিকে দেখবেন্ যেন রচনা করেছে এক বিশেষ ধরণের কারুকার্যের ঠাসবুনুনির নক্শা কয়েকদিন ধরে যদি দেখতে থাকেন, তবে আরও আকর্ষণীয় বস্তুর সন্ধান পাবেন নিশ্চয়ই-- হঠাৎ লক্ষ্য করবেন্ এক নতুন তারার আবির্ভাব—তা ছাড়া চাঁদের কথা নাই বা বললাম্। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিতে মুগ্ধ হয়না এমন মানুষ বিরল। আর একটা বিশেষ জিনিষ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সেটা গ্রহ। এদের চিনতে আপনার ভুল হবে না—কারণ তারারা সারাক্ষণই চমকায় কিন্তু স্থির আলো দেয় গ্রহরা। আবার আপনি সাক্ষীও হতে পারেন এক তারার মৃত্যুর। হঠাৎ দেখবেন্ এক উজ্জ্বল আলোর ঝলক আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য এক প্রান্তে ছুটে যাবে। মনে হবে, বুঝি এক তারা খসে পড়ল, আসলে কিন্তু তা নয়, এদের বলে উল্কা। একদিন হয়ত দেখতে পাবেন আপনার সামনে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে এক উজ্জ্বল পিণ্ড, সংগে থাকতেও পারে দীর্ঘপুচ্ছ—এটা ধূমকেতু—বেড়াতে আসে মাঝে মাঝে। আকাশের শোভা অতি মনোহর, বৈচিত্র্যও যথেষ্ট, কিন্তু একটি উজ্জ্বল ধূমকেতু আকাশের চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে সবাইকে নিয়ে যেতে পারে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশে এমনটা আর কোনও জ্যোতিষ্কের পক্ষে সম্ভব নয়।

এবার আসুন একটা দুরবীণের সাহায্য নেওয়া যাক্। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীরতা আর কিছু অনুধাবন করতে পারবেন্। দেখতে পাবেন যুগ্মতারা, তারাপুঞ্জ ও নীহারিকা। ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্রে বিপুল বিস্ময়ে আপনি মুগ্ধ হয়ে তাদের সংগে একাত্মতা বোধ করবেন্। তবে, সবচেয়ে অবাক হবার পালা এবার আপনার—বিপুল বিশ্বে যে চমকপ্রদ বস্তুসম্ভার ছড়ানো রয়েছে, তা জানতে গেলে আপনার একটা জীবনে সম্ভব হবে না। ধরুন কোনও একদিন রাত্রে আপনি লক্ষ্য করলেন বেশ কিছু নক্ষত্রমণ্ডলী, কয়েকটা গ্রহ, আরও নজর করলের চাঁদের গায়ে কিছু দাগ, তার সংগে দুরবীণ দিয়ে চিহ্নিত করলেন কয়েকটা যুগ্মতারা, তারাপুঞ্জ ও নীহারিকা। পরদিন রাত্রে ঐ একই সময়ে কিন্তু আপনি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন—সেই একই রয়েছে আপনার মাথার উপর কিন্তু বদলে গেছে তার অনেকখানি—কয়েক হাজার যুগ্মতারা, বেশ কয়েকটা নতুন নক্ষত্র, চাঁদের গায়ে অসংখ্য দাগ এবং অজানা অনেক বিস্ময়। ছ'মাস পরে আবার দেখবেন্ প্রায় সম্পূর্ণ নতুন চেহারা। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো মেরুপ্রদেশের কথা স্বতন্ত্র। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে মানুষ জানতে চেয়েছে নিজেকে, এই পৃথিবীকে, আকাশকে ও বিশ্বলোককে। এজন্যে তার যেমন আগ্রহের সীমা নেই, তেমনই প্রচেষ্টাও অন্তহীন তবে এটা তো ঠিক যে আমাদের অনুভূতির সীমানা খুবই ছোট। আমরা কতটুকুই বা দেখতে পাই কতটুকু শুনি। তা ছাড়া এই মহাবিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিশেষরূপে আমাদের কাছে ধরা দেয়—কারণ আমাদের চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। কিন্তু এখানেই আবার আমাদের অবাক হওয়ার পালা। মানব-সৃষ্টির প্রথমাবস্থা থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত খালি চোখের দৃষ্টিশক্তির উপরই জ্যোতির্বিদদের নির্ভর করতে হতো। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ এমন অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, যেগুলি আবার নতুন করে জানা যায় পরবর্তীকালে যন্ত্রের মাধ্যমে। তারপর আবিষ্কৃত হ'লো দুরবীক্ষণ যন্ত্র—মানুষের দৃষ্টিশক্তি হলো সম্প্রসারিত সংগে সংগে আমাদের অনুভূতির প্রকৃতি ও বোধের সীমা হলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। আকারে প্রকারে ও যান্ত্রিক কৌশলে দুরবীণের আজ এতদূর উন্নতি হয়েছে যে, দুইশতকোটী আলোক-বর্ষদূরের (এক আলোকবর্ষ = প্রায় নয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার কোটী কিলোমিটার) আকাশও আজ মানুষের আয়ত্তে। আজকের দিনের দুরবীক্ষণযন্ত্রে নক্ষত্র বা আকাশ পর্যালোচনার জন্য তার আলোকচিত্র ও বর্ণলিপি গ্রহণের ব্যবস্থাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারপর ধরুন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র—আলোর বর্ণলিপিতে ধরা পড়ে কোন্ নক্ষত্র কোন্ উপাদানে গঠিত তার তাপমাত্রাই বা কত, কোন্ জ্যোতিষ্ক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, কোনটার দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তাদের গতিবেগই বা কোনদিকে কত। এবার এলো বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে মহাবিশ্বের আরও বিস্তৃততর ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।

ব্যবহার হলো রাডার ও বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। চোখের দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহে অগ্রসর হল বেতার-তরঙ্গ। এলো আর এক নতুন প্রণালী—রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশ অনুশীলন। মহাকাশে সঞ্চরণশীল সব রকমের বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ পৃথিবীর বুকে আসে না, একমাত্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের কিছুটা ও আলোক তরঙ্গের সবটাই ভূপৃষ্ঠে ধরা পড়ে। সবরকম রশ্মি না আসায় ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে মহাকাশ পর্য্যালোচনায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই, রকেটের সাহায্যে যথোপযুক্ত স্থানে যন্ত্রাগার ও নভচারীকে ভূপৃষ্ঠের আবহমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতামুক্ত ঊর্ধাকাশে পাঠিয়ে সেখান থেকে বিশ্বের রূপ অনুধাবন করাই বিশেষ উপযোগী মনে হয়।

এবার আসুন, খালি চোখের সাহায্যে নক্ষত্রদের সংগে কিছু পরিচয় করা যাক্।

"হলধর হালদার একগুঁয়ে, ভারি একগুঁয়ে
আকাশের তারা গোণে সারারাত
খোলা ছাতে চিৎপাত, শুয়ে শুয়ে শুয়ে

* • • •

গোণা শেষ না হতেই শেষ হয় রাত
তারাগুলো কোথায় পালায়
হলধর হয়রাণ ভোরের জ্বালায়।"

কবিকল্পনায় তারার সংখ্যা অগণ্য মনে হলেও, সমগ্র আকাশের পটে খালি চোখে কিন্তু ছয় হাজারের বেশী দেখা যায় না—আবার আমরা একসংগে আকাশের মাত্র অর্ধেকটা তো দেখতে পাই—তাই একইস্থানে একইসময়ে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজারের বেশী তারা দেখা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, তারা গোণা খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ অনেক, তবে প্রথম অসুবিধে আপনার হবে এখানে—এক তারা ছেড়ে অন্য তারায় পৌঁছুলেন হঠাৎ দেখলেন মাঝে দু দুটো তারা গোণা হয় নি, কারণ এতক্ষণ এদের বড়ই ম্লান দেখাচ্ছিল, প্রায় অস্পষ্ট, অন্ধকার গভীর হওয়ার সংগে সংগে উজ্জ্বল হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সব নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সমান নয়। খালিচোখে আমরা যে নক্ষত্রদের দেখি, প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদরা উজ্জ্বলতা অনুসারে তাদের ছয় ভাগে ভাগ করেছেন। অত্যুজ্জ্বল তারাদের বলা হয় প্রথম প্রভার ও ক্ষীণজ্যোতি তারাদের বলা হয় ষষ্ঠ প্রভার। মনে রাখবেন—সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার প্রারম্ভেই যে তারাদের আকাশের পটে দেখা যায়, সেগুলিই আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।—এই নক্ষত্ররাই প্রথম প্রভার। এরপর যে নক্ষত্রদের দেখা যায়, তারা দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র। ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্র এত ম্লান যে, খালিচোখে দেখা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। হিসাব করে

দেখা গেছে যে, নক্ষত্রদের দীপ্তিমাত্রা বা প্রভার মধ্যেও এক নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে। ষষ্ঠ প্রভার তারার চেয়ে পঞ্চম প্রভার তারা প্রায় আড়াই গুণ বেশী উজ্জ্বল আবার পঞ্চম প্রভার নক্ষত্রদের চেয়ে চতুর্থ প্রভার নক্ষত্ররাও প্রায় আড়াই গুণ বেশী উজ্জ্বল ; এইভাবে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ প্রভার তারাদের চেয়ে প্রথম প্রভার নক্ষত্রদের দীপ্তি প্রায় একশো গুণ বেশী। একই হিসাব অন্য জ্যোতিষ্কদের বেলায় প্রয়োগ করা যাক্। প্রথম প্রভার নক্ষত্রদের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে বলা হবে শূন্য প্রভার জ্যোতিষ্ক, তার আড়াই গুণ বেশী দীপ্তি থাকলে নাম দেওয়া হবে — ১(বিয়োগ এক) প্রভার ইত্যাদি। এই হিসাবে সূর্যের প্রভার মানাঙ্ক হবে—২৬°৮, পূর্ণচন্দ্রের—১২°৬, শুক্রের—৪°৩, মঙ্গলের—২°৮, বৃহস্পতির—২°৫ ইত্যাদি। তবে মনে রাখবেন—এই প্রভা কিন্তু নক্ষত্রের আপাতপ্রভা, আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে খালি চোখে যেমনটি দেখি, দূরত্ব মেপে নয়। এই হিসাবে মোটামুটি একুশটা নক্ষত্র পড়ে প্রথম প্রভার তারারূপে। ওদের মধ্যে উজ্জ্বলতমটীর নাম লুব্ধক ও ক্ষীণজ্যোতিটীর নাম মঘা। দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রদের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশী—এদের মধ্যে বেশী পরিচিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটী তারা। তৃতীয় প্রভার নক্ষত্রদের সংখ্যা আরও বেশী—যত বেশী মান, সংখ্যাও তত বেশী।

এইসব খালিচোখে দেখা নক্ষত্রদের জানার সুবিধের জন্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা সমগ্র আকাশকে ৮৮ ভাগে ভাগ করেছেন—প্রতিটি ভাগে এক একটা তারামণ্ডল। আবার কোন কোন তারামণ্ডলে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারাদের নিয়ে এক একটা বিশেষ আকৃতি ও কল্পনা করা হয়েছে। আকাশের দিকে বেশ মন দিয়ে একটু লক্ষ্য করুন—দেখবেন্ কয়েকটী তারা কোথাও একটী ত্রিভুজ, কোথাও একটী চতুর্ভুজ, কোথাও একটী জিজ্ঞাসাচিহ্ন রচনা করেছে আবার কোথাও বা একটী মানুষ বা একটী প্রাণীর আকার ধারণ করেছে। তাই প্রাচীনকালে আকাশের তারামণ্ডলকে প্রায় সবদেশেই সেখানকার পুরাণের গল্পের সংগে জড়িত করে কোনও দেবতা, ঋষি, বীর বা মহাপুরুষের আকারের সংগে মিল খুঁজে বের করা হয়েছে এবং সেই নামে অভিহিত করা হয়েছে। কখনও কখনও কোনও প্রাণীর বা কোনও অতিপরিচিত বস্তুর সংগেও সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। যেমন, আপনাদের বিশেষ পরিচিত সপ্তর্ষিমণ্ডল—এই তারামণ্ডলে সাতটী বেশ উজ্জ্বল তারাকে (দ্বিতীয় প্রভার) বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্নের আকারে বা লাঙ্গলের আকারে দেখা যায়। সাতজন ঋষির নাম অনুসারে এদের নাম দেওয়া হয়েছে—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। এখন ধরুন আপনি অরুন্ধতী নক্ষত্র জানতে চান—যদি আপনাকে বলা হয় যে এটী সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠের কাছের এক ক্ষীণপ্রভ তারা—তবেই তার হদিশ বের করা আপনার পক্ষে সম্ভব। সপ্তর্ষির পুলহ ও ক্রতুতে একটী কাল্পনিক রেখা দ্বারা নীচের দিকে বাড়ালে একটী মাঝারি উজ্জ্বল তারার পাশ

দিয়ে যায় এই নক্ষত্রটির নাম ধ্রুবতারা। সপ্তর্ষির ক্রতু ও পুলহের সংযোজক রেখাকে ধ্রুবতারার বিপরীত দিকে তার প্রায় সমান বাড়ালে সিংহমণ্ডলে পৌঁছনো যায়। রেখার পশ্চিমদিকে ছটা তারা নিয়ে মঘানক্ষত্র রচনা করেছে একটা কাস্তের আকৃতি—এই কাস্তের হাতলেই আছে প্রথম প্রভার ক্ষীণজ্যোতি তারা মঘা। এই মঘা সিংহমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। চৈত্র সন্ধ্যায় পূর্বাকাশের দিকে তাকান এই কলকাতায় বসে—দেখবেন যেন এক প্রকাণ্ড সিংহ পশ্চিমদিকে মুখ করে উন্নতমস্তকে শুয়ে আছে। মঘানক্ষত্র সিংহের সামনের পায়ের থাবায় এবং উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র তার লেজে। আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারাটীর নাম লুব্ধক। অন্য দুটী প্রথম প্রভার নক্ষত্র ঈষৎ হলদে সরমা লাল ও লাল আর্দ্রাকে নিয়ে নীল রং এর লুব্ধক রচনা করেছে এক বৃহৎ সমবাহু ত্রিভুজ। এই লুব্ধক বড় কুকুর মণ্ডল বা মৃগব্যাধমণ্ডলের অন্তর্গত। এই মণ্ডলে লুব্ধক এবং অপর পাঁচটী তারাকে এক ধাবমান শিকারী কুকুরের মত দেখায়—তাই চেনাও সহজ। জ্যোতির্বিদদের কাছে লুব্ধক নক্ষত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা এক যুগ্মতারা—এর সঙ্গীটী এক নিতান্ত ক্ষুদ্র শ্বেতকায় তারা সিরিউস-বি। এই শ্বেতবামনের আয়তন পৃথিবীর তিনগুণের কাছাকাছি কিন্তু ওর পৃথিবীর ওজনের আড়াই লক্ষ গুণেরও বেশী—এর দেহ থেকে এক দিয়াশলাই-ভর্তি বস্তু নিলে তার ওজন দাঁড়াবে একটনেরও বেশী।

এবার কয়েকটী বিশিষ্ট তারামণ্ডলের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করা যাক্। দিনের বেলা যদি আমরা নক্ষত্র দেখতে পেতাম, তাহলে দেখতাম—সূর্য দিনের পর দিন কয়েকটী নক্ষত্র-মণ্ডলের উপর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে একটু একটু অগ্রসর হচ্ছে। বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে বার মাসে সূর্য যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই বারটী রাশি বা তারামণ্ডল ঘুরে এক বছর পরে আবার ফিরে আসে পূর্বস্থানে। সূর্যের এই পথটীর নাম ক্রান্তিবৃত্ত। এই ক্রান্তিবৃত্ত আকাশের এক কল্পিত বেষ্টনী রেখা। কিন্তু রাশীচক্র বেষ্টনী রেখামাত্র নয়। বেশ কিছু চওড়া—এটী ক্রান্তিবৃত্তের দুই পাশে সমান চওড়া, অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের ৯° ডিগ্রী উত্তর থেকে ৯° ডিগ্রী দক্ষিণ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। দেখলে মনে হবে যেন আকাশের নক্ষত্রখচিত কটিবন্ধ। প্রতি রাশির উজ্জ্বল নক্ষত্রদের নিয়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা এক এক আকৃতি কল্পনা করে সেই আকৃতির নামে প্রতি রাশির নামকরণ করেছেন। যেমন মেষরাশির নক্ষত্রদের রেখাযুক্ত করলে কতকটা মেষের আকৃতি পাওয়া যায়। তা ছাড়া সিংহমণ্ডলের কথা তো আগেই জেনেছেন। ক্রান্তিবৃত্ত থেকে রাশীচক্রে আসার কারণটী খুলে বলা যাক্। সূর্যকে আমরা যেমন ক্রান্তিবৃত্তে ঘুরে বেড়াতে দেখি, পৃথিবী থেকে সব গ্রহ-উপগ্রহগুলিকেও রাশিচক্রের নক্ষত্রগুলির উপর দিয়ে বিভিন্ন গতিতে ভ্রমণ করতে দেখি—কারও বেড়াবার যায়গা ক্রান্তিবৃত্তের সামান্য উত্তরে, কারও বা সামান্য দক্ষিণে, কিন্তু সকলের পথই রাশিচক্রের অন্তর্গত। চন্দ্রও রাশিচক্রের অন্তর্গত কতকগুলি

নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে মোটামুটি ২৭ দিন পরে আবার আগের যায়গায় ফিরে আসে। মোটামুটি হিসাবে এক এক রাশি ভ্রমণ করতে বা ভোগ করতে চাঁদের লাগে ২'২৫ দিন, বুধের লাগে ১৮ দিন, শুক্রের ২৮ দিন, সূর্যের ৩০ দিন, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বৃহস্পতির ১ বছর, শনির ২'৫ বছর, ইউরেনাসের ৭ বছর ইত্যাদি। রাশিচক্রের নক্ষত্রদের পশ্চাৎপটে রেখে তাদের সামনে দিয়ে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ যে ভাবে আকাশ পরিভ্রমণ করে, আপনি ও আমি খালি চোখেই তা স্পষ্ট দেখতে পাই। তা ছাড়া সূর্য, চন্দ্র, গ্রহগণ কোন্‌দিন রাশিচক্রের কোন্ স্থানে আছে, কতকগুলি সাঙ্কেতিক লিপি দিয়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা যা বলে গিয়েছিলেন, তার ব্যতিক্রম আজও হয় নি। হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ কেবলমাত্র খালি চোখের সাহায্যে যা গণনা করেছিলেন – তা আজও নির্ভুল। ঘরে ঘরে সবারই পঞ্জিকা আছে— দেখতে পাবেন লেখা আছে বৃ ৪।৬।১২।১০—তার অর্থ বৃহস্পতি চাররাশি অতিক্রম করে পঞ্চমরাশির অর্থাৎ সিংহরাশির ৬° ১২′ ১০″ স্থানে আছে অথবা সিংহরাশির ৬ অংশ ১২ কলা ১০ বিকলা স্থানে অবস্থিত।

আমরা ভারতবাসীরা কি আমাদের হৃদগৌরব পুনরুদ্ধারে আজও সচেষ্ট হ'ব না?

"বাংলার ব্যবসার ইতিহাস উলটালে দেখতে পাই, বাংলাদেশে বাঙালীর দুই রকম বানিজ্যেই হাতযশ ছিল। কিন্তু আজ বাংলার লক্ষ্মী শ্রী বড়বাজারে; অন্তর্বানিজ্যই বলুন, বহির্বানিজ্যই বলুন একে একে বাঙালীর হাত থেকে সব চলে গেছে—যা—যাচ্ছে—।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

গ্রাম্য ছড়ার সন্ধানে

গোবিন্দ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩য় বর্ষ, কলা : (সংস্কৃত অনার্স)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হইয়া যখন মহাবিদ্যালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলাম এবং বিশ্বকবির "লোকসাহিত্যের" কয়েকটি ছড়ার সহিত পরিচিত হইলাম তখন হইতেই আমার অন্তঃকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যের ন্যায় ছড়া সংগ্রহের ইচ্ছা হইয়াছে। তাই আজ কাজের মাঝে, সময়ের ফাঁকে ফাঁকে চলিয়া যাই গ্রামে গ্রামান্তরে, শহর থেকে দূরে, যেখানে মানুষের হৃদয়টা মাঠের সবুজ গাছের ন্যায় শ্যামল-মধুর-স্নিগ্ধ-শান্ত পরিবেশে ঘেরা। মিশিয়া যাই সেই পরিবেশের সহিত। অনেকেই হাসিয়া বলিয়াছেন,—মশাই কি করিবেন এই ছড়া নিয়ে? এর চাইতে কাজ করুন, লেখাপড়া তো শিখেছেন, পাশও করেছেন একটা, আপনাদের কি আর এইভাবে ঘোরা মানায়। বসিয়া ভাবিতে থাকি তাহাদের কথাগুলি যুক্তি সংগত। তবুও মন যে মানিতে চাহে না, আমি ঘরে বসিয়া থাকি কি করিয়া। তাই চলিয়া যাই, পাড়ি দিই অচেনার পথে, অজানার স্রোতে ভাসাইয়া দিই আমার বিরাম বিহান তরণী।

কিন্তু কিসের জন্য আমার এই চলা? উদ্দেশ্য আমার একটি এবং তাহা হইলো এই যে, গ্রাম্য ছড়া-গান কবিতা যাহা চিরদিন মা-ঠাকুরমাদের মুখে মুখে বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। সেই অনাদিকাল হইতে সেইগুলি সংগ্রহ করা। উদ্দেশ্য বা লাভ—বাংলা ভাষাকে, বাংলা কাব্যকে একটু সমৃদ্ধ করা. ইহা ছাড়া অন্যকিছুই নহে। তাই দ্বারে দ্বারে গিয়া অনুরোধ করিয়া যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি বা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও উহার যে একটা কাব্যিক মূল্য আছে তাহা আজ আমার চক্ষের সম্মুখে ধ্রুব জ্যোতিষ্কের ন্যায় জ্বল জ্বল করিতেছে।

বাংলার প্রকৃতি তাহার অপূর্ব সৌন্দর্যরাজি, প্রাকৃতিক সম্পদ মনুষ্যদিগের জন্য যেমন দান করিয়াছে অকুণ্ঠভাবে, অকৃপণ হস্তে, তদ্রূপ কবিগণও তাঁহাদের কবিত্ব শক্তির দ্বারা বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে অকৃপণ হস্তে কবিতা-ছড়া-গান প্রভৃতি দান করিয়া বাংলা ভাষাকে, বাংলার সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ঐ ছড়াগুলি কে বা কাহারা কবে কি ভাবে রচনা করিয়াছেন তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না।

বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য বা নানান রকমের রসরসের জন্য যে সকল ছড়া প্রচলিত আছে তাহা অতি চমৎকার, অদ্ভুদ ও সুন্দর। বস্তুত শিশু ও ছড়ার মতো পুরাতন

আর কিছুই নাই। তেমনি ছড়াগুলি ও শিশুসাহিত্য, তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে। কিন্তু এমন পদ বা ছড়া আছে যাহাদের মধ্যে কোন রকমের ভাবের সামঞ্জস্য নাই, নাই কোন রীতি। যাহাই হউক তবুও এইগুলি যে বাংলা ভাষার একটি ভাবসমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

আমি বিভিন্ন ছড়া বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে একটির সহিত আর একটি পদের অনেকক্ষেত্রে মিল নাই, নাই অর্থের সংযোগ। কিন্তু উহাদের মধ্যে আবার কোনটিও বর্জনীয় নহে। মুখে মুখে ইহা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বহুপদ মূলপদ হইতে বিদায় লইয়াছে। তবুও ইহা আমাকে মজাইয়াছে, আমার মন হরণ করিয়াছে, আমায় প্রায় ঘরছাড়া করিয়া প্রকৃতির সহিত মিশাইয়াছে। সুতরাং জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখা নিছক একটা উপহাসের ব্যাপার নহে।

বাংলার ছড়া অতি মনোহর, বাংলার ছড়া চিত্রচঞ্চলকারী হরিণীর ন্যায়, বাংলার ছড়া ছোট বড় সকলেরই প্রাণের জিনিস। তাই 'মা' যখন তাঁর শিশুপুত্রকে বুকের উপর রাখিয়া ঘুম পাড়ান, তখনই তাঁহার মনে উঁকি দিয়া থাকে সেই ছড়া যাহা তাঁহার পরিচিত—

(ক) ঘুমো ঘুমো ঘুমো সোনার মাণিক ঘুমো।
সোনার মাথায় টিকলি দেবো কপালে দিই চুমো।
জামাই দেবো সোনার বোতাম হাতে সোনার ঘড়ি।
মটর গাড়ি করে সোনায় করবে ঘোরাঘুরি।
এখন তুমি সোনার মাণিক ঘুমিয়ে ওগো নাও।
কাজ করতে অনেক বাকী কাজ করতে দাও। [স]

—ইহা শুধু ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার ব্যাপার। কিন্তু শুধু কি ইহাই, আরো কতো কি আছে তাহার ঠিক নাই অন্ত নাই, নাই তাহার শেষ। কখনও আবার মা তাঁহার শিশুকে ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন—

(খ) খোকন সোনা ঘুমো
আসছে একটা লুমো।
একজোড়া ডাক তার
আর একজোড়া ঝুনো।

খোকাকে মা ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভয় দেখাইতেছেন যে, "ঐ লুমো আসিতেছে, তাহার ডাক ভিষণ জোরে আর একজোড়া তাহার "ঝুনো" আছে। কিন্তু এখানে "ঝুনো" এর অর্থ কি তাহা এখানে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা নাই। তারপর—

(গ) ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো।
আমার বাড়ি নেইকো পিঁড়ি খোকার চোখে বসো।
বাটাভরা পান দেবো গালপুরে খেয়ো।
শান্তি সুখের ঘুমটি আমার খোকার চোখে দিও।

—শুধু ঘুম পাড়ানিই নহে, আরো অনেক কিছু আছে যাহা মানুষের মনকে হরণ করিতে পারে।

(ঘ) দোতলা বাড়ি কলের গাড়ি, বৌ এনে দাও খেলা করি।
বৌয়ের মাথায় লট্‌কা চুল কোথায় পাবো গাঁদা ফুল।
গাঁদাফুলের ছড়াছড়ি চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি।

—এই ছড়াগুলির মধ্যে বিভিন্ন রসের সন্ধান পাওয়া গেলেও ইহাদের মধ্যে অর্থের সঙ্গতির অভাব ঘটিয়াছে। যেমনটি এখানে ঘটিয়াছে—

(ঙ) কট্‌কটিরে নট্‌নটিরে গোবর ভেঙ্গে দে।
আশিন্ মাসে মেয়ের বিয়ে পাল্কি এনে দে।
পাল্কির ভিতর পাকা পান বর এসেছে মোছলমান।
বরের মাথায় কাটকুটো বৌয়ের মাথায় ঝাঁপা।
আন্ধারি শালা তোর গোঁফদাড়ি পাকা।

—এখানে কাহাকে গোবর ভাঙ্গিতে বলা হইতেছে তাহা সঠিকভাবে বলা না হইলেও ইহা বোঝা যাইতেছে যে, আশ্বিন মাসে মেয়ের বিবাহের জন্য পাল্কি আনিতে বলা হইতেছে এবং বর হইবে একজন বৃদ্ধ মুসলমান।

এইরূপ বিভিন্ন ধরণের ছড়া আমাদের বাংলার গ্রামে গ্রামে বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া আছে, যাহার শেষ নাই সীমা নাই। শুধুমাত্র তাহা কুড়াইয়া লইলেই হইল!

যাহাই হউক, বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার অবকাশ নাই তাই অল্প কথায় শুধুমাত্র কয়েকটি ছড়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা নিম্নে উপস্থাপিত করিতেছি।

(চ) আলুর পাতা থালু থালু ভেন্নার পাতা দই।
সকল জামাই ভাত খেলো মেজো জামাই কই।
ঐ আসছে মেজো জামাই গামছা মুড়ি দিয়ে।
ও গামছা নেবো না মেয়ের বিয়ে দেবো না।
মেয়ে দেবো সাজিয়ে টাকা নেবো বাজিয়ে।

(ছ) ও পারে ধনচে গাছটি হেলেদুলে পড়ে।
তাই দেখে ননদিনী জলে পুড়ে মরে॥

(জ) বড় বৌ রন্ধন তুলতে যাও॥
ছোট বৌ বেগুন তুলতে যাও॥
বেগুন তুলতে ফুটলো কাঁটা গেল সইয়্যা সাধনতলা
সাধনতলা কতোদুর, বাড়ী বাড়ী চাম্পা ফুল
সেই ফুলের গন্ধে খোপা নিল নল্দে
খোপার উপর বোড়া সাপ, লাফ দিয়ে ওঠে জামাইবাপ
জামাই বাপ তামাক খায়, ঘর ভইর‍্যা ধুয়া যায়
সেই ধূমা কালা, জামাই বাপ আমার হালা।

"সাহিত্যের বিচার করিবার সময় একটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি; দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।"

—রবীন্দ্রনাথ

"Democracy—is it at stake in India ?"

Debashis Ganguly
3rd Year B.A.
(Hons. Economics)

Of late the term 'Total Revolution' is very frequently used in the news papers. To-day it has almost become a fashion to go about talking of a revolution. The frequent use of the term has lowered its Gravity. The term is not so emphatic as it was in the case of 'Industrial revolution', 'French revolution' or cultural revolution. The signification of the term is very vague and imprecise to the common people as it figures very often in the speeches of our polilicians.

Total revolution implies a radical transformation and a fundamental charge in social order. It needs no preparation or invitation, nor can it be made, It appears when the situation gets ripe.

The call for a radical change is given by a veteran politician, a freedom fighter, Lokamanya Sri Jaya Prokash Narayan who is popular as J.P. He launched the movement on Gandhian way. The twin objectives of his movement war to remove corruption and to save democracy which was on the verge of extinction according to him.

The prevailing conditions in the country is indeed a revolutionary one. The horizon of the Indian Economy is over cast with clouds and the nation is groping in the dark to came to a position of economic and social stability. The rampant corruption, the acute food crisis (Though it is man made) galloping inffation industrial stagnation, adverse balance of payments and the global oil crisis have all conspired together to wreck the expectation of a millenium in the wake of the much publicised 'Green Revolution'. Under these circumstances the miseries of the people beggar

description and it proper steps are not taken to mitigate people's sufferings, then there will be no dearth of fillips to turn the green revolution into a red one.

I do admit India needs a thorough overhaul. But this surely can not be achieved by ousting any particular Government or by dissolving a particular state assembly. J.P's movement is largely confined to Bihar only. The Bihar stalwart has asked the students to stay away from their classes. This will lead the student community to astray.

J.P s movement aims at establishing true democracy and preserve it. The legislative assembly is a democratic institution. If the assembly is dissolved, then how can democracy survive? Democracy is the most cherished form of political system. But it is very difficult to maintain it in an underdeveloped country. India, despite her tremendous odds has adhered to the democratic system.

It seems that the J.P. movement is directed more to the ousting of prime minister Mrs Indira Gandhi, than to the combating of corruption. He denounces Indira Gandhi for subversion of democracy in India, Because of the existence of democracy J.P. is enjoying the freedom of speech to denounce and to villifye the Government in the open. Had there been no democracy it would not have been possible for J.P. to conduct such anti-Government movements. Moreover, who is Indira Gandhi to subvert democracy? It is the people who had give their mandato to her to lead them. Under democracy the Government is made of the people, by the people, for the people.

Mr Jaya Prakash Narayan also urges the establishment of a partyless democracy and partyless Government. Democracy can not be partyless. Though democracy means the rule of the people as against the rule of any individual, but the mass of people can not govern. Mob rule inevitably leads to confusion and chaos. Democracy can function only through

distinct, properly organised and efficiently led groups of people who stand for certain principles and policies by which guide them in their effort to promote the welfare of the country. It is generally agreed that no democracy can function without political parties which are considered indispensible to every democratic set up. Political parties have no place only in a despotic rule or under a dictator or authoritarian rular. A partyless democracy can not function and the very concept is ill-founded. It is, therefore, meaningless to talk about a partyless democracy in India.

Mr Narayan is a true Gandhian. his movement is also based on Gandhian principles. But his followers have had recourse to violent means. The doctrin of non violent revolution espoused by Gandhiji is not a programme of seizure of power ; but it is a programme of transformation of society by resisting the evil. It was Gandhiji's firm conviction that revolution should be brought about by non-violent means. Referring to the French and Russian ravolutions he observed that they had failed to realize democratic ideals because these were fought with the weapon of violence. He was of the view that bloody revolution would not succeed in India for the reason that the massess would not respond. To-day corruption is almost ingrained in people in every walk of life. It destroys the morals of our politicians bureaucrats educationists, industrialists, even the common people. J.P's movement can create a stir in the minds of the people, but it can not change the minds of the people. Revolution is something which can not be imposed from outside, it comes from within.

As long as the minds of the people can not be altered, it would be futile to talk about a revolution. Last but not the least, is the fact that we lack patriotism. Most of our status-concious, power loving pseudo-patriots and politicians are more interested in safe guarding aheir own ends than in serving the nation. Dr. Johnson regarded patriotism as the last refuge of a scoundrel. The politicians of to day regard it as a convenient means to personal ends. The colossal deception they practice

is the very antithesis of patriotism and yet they describe themselves as the very embodiment of social and national service.

Moreover, for the last one or two years India has witnessed an unprecedented chaos in her political, social and economic fronts. Some of our political leaders have tried to exploit this situation to satisfy their selfish motives. They are out to create trouble. They indulged in various subversive activities. Their sole aim is to topple Mrs Indira Gandhi's Government. Some of them even went to the extent of inciting our police to rebel and the army to mutiny. Any Government worth the name can not tolerate such a situation. No responsible Government can permit the destructive activities of the kind which the opposition parties have resorted to in the name of democracy Our Prime Minister says, "Democracy is not the freedom to destroy, nor to incite indiscipline. Instead of helping the armed forces and the police to protect India and its people, there are many frustrated elements who are out to destroy the country. They are trying to create indiscipline, anarchy and chaos to suit their own political purposes. What can we do to defeat these enemies of democracy ? Respect our constitution and help the Government elected by the people in its fight against these forces of evil. This is true democracy".

Some opposition leaders have even tried to malign her by taking some extra constitutional methods. Some went to the length of assassinating her. She says that she has been receiving threatening letters everyday, but she attaches little importance to them "as she has dedicated her life to the eradication of the poverty of the millions. Democracy and freedom of expression can not mean systematic and virulent character assassination without any basis in the name of democracy. The opposition has created an atmosphere of confusion and chaos throughout the country which has led to violent incidents.

To save the country out of this impasse and to meet the threat of internal disturbances on 26th June 1975, Sm Indira Gandhi proclaimed emergency.

To safeguard the nation's integrity stern measures were needed. She said, "In the name of democracy it (the opposition) has been sought to negate the very functioning of democracy. She told in the Lok Sabha that there could be no return to the days of "total licence and political permissiveness. there has to be greater self-restraint and when individual and groups do not learn how to exercise self-restraint, the constitution has to tell them where they have to stop".

The forces of disintegration are in full play and communal passions are being aroused, threatening our unity. The actions of a few are endangering the rights of the vast majority. Any situation which weakens the capacity of the national Government to act decisively inside the country, is bound to encourage dangers from outside. It is our paramount duty to safeguard unity and stability. The nation's integrity demands firm action. The threat to internal stability also affects production and prospects of economic improvement.

Millions of people from different walks of life welcome and strongly endorse the timely promalgation of emergency by the prime minister to curb anti-national and reactionary forces which are endangering the unity and freedom of India.

The emergency period is regarded as "Anusasan parba". Mrs Gandhi has asked the people to take the maximum advantage from the new situation and work towards reaching the national goods,

I am proud of being a member of the world s largest democracy. It is very difficult to pursue democratic principles in a country like India's stature Many countries attempted to establish such systems, but they failed at last

Our country has made significant progress in various spheres. She is now the sixth member of nuclear club and eleventh member of space club. But the progress has been less spectacular mainly because of the

increase in population. It is twenty-eight years since India has attained freedom, but in the life of a nation twenty-eight years is but a drop in the Ocean of time, moreover, within her short span of life, She has already experienced three invasions of her frontiers. Influx of large number of people from Bangla desh and other problems retarded India s progress. 'In any modern democracy, the question of economic betterment and social justice can not be separated from the proper functioning of democracy' says P.M.

The other reasons for the relatively poor achievements are corruption at all levels, too much of bureaucratic red-tapim resulting in unsatisfactory implementation of projects and programmes. We are also responsible for such poor developments. We appear to be more concious of our rights and less of our obligations, more anxious to have our own privileges and less cager to perform our duties.

Democracy can funtion properly only in a healthy economy. Our prime minister made an epoc-making announcement to strengthen the economy and to relieve the hardship of the various sections. particularly the down-troden and the most vulnerable section of our country. On July 1, 1975, She announced a 20 point economic programme, ranging from confiscation of the properties of smugglers to raining the minimum exemption limit for income tax. We, the students, are also to get a better deal. In the P,M's words, "students from poor families face special difficulties, if they pursue higher studies away from their homes. To help them, essential commodities will be supplied at controlled prices to all hostels and approved lodging houses. Another important measure in the educational field will be to ensure that text books and stationery are available at reasonable prices at all School, Colleges and University students prices will be strictly controlled and book banks established'.

Poverty in our country is deep-rooted. We can not get rid of it in a day or two. Our freedom will be meaningful only when proverty can be

banished from our land. No policy or programme will be able to achieve it in a short time. But it requirs time for proper materealisation. To make democracy meaningful we should share the responsibility along with our Government to make it a success.

Our P.M. asked countrymen not to except magic romedies a dramatic results. She said, "There is only one magic which can remove poverty and that is hard work sustained by clear vision, iron will and the strictest discipline. Each one of us in our place should determine to do more for our follow citizen not only for our selves".

Not only some of our leaders but many world stalwarts are shedding crocodile tears for the denise of democracy in India. But they may rest assured that democracy is flourishing here as elsewhere

There is a saying that the night is darkest before the dawn. Our country now has been passing through a very critical phase, which surely is a prelude to a new dawn.

Collected by—Pronab Mukherjee

বৃন্ত

সৌরেন্দ্র নাথ হাজরা
তৃতীয় বর্ষ : কলা বিভাগ

এক বৃন্তে যে গোলাপ ফুটেছিল
দুলেছিল মৃদু বায় আপন গৌরবে –
সবার অজান্তে যেন যৌবন এসেছিল
মেতেছিল যেন সেই আপন সৌরভে।
উথলি উঠিছে রূপ থরেথরে
বাতাস কাঁপিছে সেথা দখিনার বাস
উজানে ছুটিতে চায় প্রাণ মন ওরে
চারিদিক ভরে দেয় গোলাপে বাস।
এক দিন ফুল ছিঁড়ে পড়ে যায়
শূন্য শাখে বৃন্ত শুধু থাকে
কোকিল কুহরি সরে রিক্ত দাখিনায়
ধূলিতে মৃত্যুর স্মৃতি রাখে।
যৌবন হারায়ে যায়
রেখে যায় স্মৃতি সৌরভ
তাই লয়ে সৌরপরমায়ু
তাই নিয়ে প্রেম বৈভব।

চা-চিনি-পিরীচ-পেয়ালা

শ্যামল দাস
দ্বিতীয় বর্ষ, কলা বিভাগ

কৈলাস পর্বতের অধিষ্ঠাতাকে আরাধনায় মুগ্ধ করে ভগীরথ মর্তে আনলেন মন্দাকিনীর ধারা সহস্রাতীত স্তব্ধ জীবন স্পন্দনকে জাগ্রত করবার জন্য। আর পর্বতগাত্রে সন্ধানী সাধনায় আমরা আনলাম চায়ের মদির প্লাবন পেয়ালায়, পেয়ালায়, লক্ষ হতাশ প্রাণের উজ্জীবন কামনায়।

এই ভূমিকায় ছিদ্রান্বেষীরা আপত্তি তুলতে পারেন নামের নজির তুলে। চা, চিনি, পিরীচ, পেয়ালা তো বিভিন্ন দ্রব্যের কথা—তাতে বিশেষ করে চা পানীয়ের কথা ওঠে কেন? বিশেষতঃ আপনি যদি রাজনীতির লোক হন, তবে হয়ত চায়ের মধ্যে আপনি শত শত বঞ্চিতের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, হাজার হাজার কলিজার টাট্‌কা রক্তের রং দেখতে পাবেন। আবার যদি কোন Economist হন, তা হলে এই চায়ের উৎপাদনমূল্য কত পড়ছে তার একটা ratio কষতে বসে যাবেন। কিম্বা আপনি যদি কোন Scientist হন, তাহলে আবার চায়ের জল ফুটতে দেখলে তার কতটা উত্তাপ, কতটা আন্দাজ গ্যাস জন্মাতে পারে তার হিসেব কষতে বসে যাবেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো জলে আর চা-পাতাই পড়বে না। আর যদি নজরুলিশি সাহিত্যিক হন তাহলে শরৎচন্দ্র, সত্যজিৎ রায়, উৎপল দত্ত আর সমতালে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুলবেন ঝড়। এমনি সব মতান্তরে নানা বাতান্তর হবে, ব্যবহারের ভিন্নতার দিকের কথা উঠবে। হয়তো কেউ বলে বসবেন চিনি যে শুধু চায়েই ব্যবহার হয় এমন তো নয়, ছোট ছেলেদের দুধে একটু চিনি লাগে, মিষ্টি খাবার তৈরী করতে গিয়ে চিনি লাগে, রুটির পাতে তরকারী ভয়ানক ঝাল লেগেছে—নাক চোখ দিয়ে ধারা বইয়ে দিয়েছে তখন একটু চিনি মুখে না দিলে জিবের জ্বলুনী থামে না—উপোসের পরে একটু চিনির জল না খেলে প্রাণ বাঁচে না—এমনি আরো কত হাজারো রকমের কাজ করছে চিনি। তেমনি পিরীচ পেয়ালাও। পেয়ালাতে যে শুধু চা-ই খাওয়া যায় এমন কোন কথা নেই, শীতকালে দাড়ি কামাবার কাজে এক পেয়ালা গরম জল ব্যবহার হতে দেখেছি, আবার তেল মাখার কাজেও হাতলভাঙ্গা পেয়ালার জোর ব্যবহার আছে, বাদ্য হিসেবেও পেয়ালার নাম ডাক কিন্তু কম নয়। কারণ এই একটিমাত্র বাদ্যই বোধহয় সার্বজনীন। অতিরিক্ত খুশীর সময় ট্রেন, ট্রেন পেয়ালা বাজিয়ে গান করেন নি এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। চিন্ময় লাহিড়ীর একটা গান মনে পড়ছে 'মুখে ভর দে পেয়ালা'। পিরীচের ব্যাপারেও তাই। সে যে শুধু চায়ের পেয়ালাকেই বুকে বহন করে বেড়ায় তা নয়, অনেক সময় উপুড় হয়ে পড়ে রান্নাঘরে এমন

অনেক জিনিষকে আড়াল করে রাখে তা ঔদরিকদের লোভের উদ্রেক করে। আবার সোজা হয়ে থাকলেও এমন অনেক জিনিষ যে তার বুকে বহন করে নিয়ে আসে তা দেখলে আমাদের রসনা রসায়িত হয়ে ওঠে। কাজেই চিনি, পেয়ালা, পিরীচ বললেই যে চা বোঝাবে এমন কোন কথা নেই।

নেই তা সত্যি। মানলাম আপনাদের কথা। কিন্তু এ তো স্বাভাবিক নয়। অতি বুদ্ধিমান মানুষ তার বুদ্ধির আতিশয্যে প্রায়শই বহু দ্রব্যকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় কাজে লাগিয়ে এসেছে। যেমন ধরুণ গোলাপ আতর। নরম তুলতুলে গোলাপ ফুলকে গাছ থেকে খসিয়ে, দলে পিষে তৈরী করা হল নির্য্যাস। আরও বাস্তব আরও জীবন্ত উদাহরণ চান? প্রেফ লজিক ক্লাসের লাষ্ট বেঞ্চের দিকে নজর দিন, সেখানে যারা সারি সারি বসে হয় "গোরে গোরে ও বাঁকে ছোরে" "লারে লাপ্পা" ইত্যাদি ভাঁজছে কিম্বা আরও নিশ্চিন্তে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে, তাদের নিশ্চয় আপনি স্বাভাবিক বলবেন। লজিকের কসরতি হয়ত ঘুমের সহায়ক হতে পারে তা বলে ক্লাসটাকে বোম্বাই গান ভাঁজার আড্ডায় পরিণত করাকে নিশ্চয় আপনি স্বাভাবিকতা বলবেন না। এর পরে আসুন কোন একটা চা-ঘরে গিয়ে একটু উঁকি মেরে আসা যাক। এরাই একমাত্র বলতে পারে "Men may come, and Men may go. But I remain for ever". ওই শুনুন ঐ কোনের টেবিলটায় —কি শুনছেন? ষ্ট্যালিনের গোঁফ ও লেনিনের দাড়ি সহ তাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার? আচ্ছা আসুন এই কোণে কি? সায়রাবানু, রাজেশ খান্না একটু ঘুরে যান—কান পেতে শুনুন "আশুতোষ কলেজ…।" ওদিক এইবারে হালায় ইয়েরে ভোট দইয়া নাকানি চুবানি খাইতে অইব; কইয়া দিলাম। একটু কোণের দিকে কান পাতুন—মোহনবাগানের কী অবস্থা মাইরি—একেবারে ল্যাজে গোবরে। মাঝখানে দাঁড়ান—মায়া, মায়া, সব মায়া; বেরিয়ে এসে আপনিও ভাবেন সব মায়া—কিন্তু সাবধান! ট্রাম চাপা পড়বেন না যেন। ওটা আবার বড় বেরসিক কি-না, মায়াবাদ বোঝে না।

আরো দেখুন যে আপনি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ধন্য হচ্ছেন অথবা পেয়ালাকে ধন্য করছেন, সে যাই হোক আমার তাতে আসে যায় না কিছু। কিন্তু আপনার এই চায়ে চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা বিরাট আন্তর্জাতিকতার বীজ স্থাপিত হচ্ছে, তা কোন-দিনও ভেবে দেখেছেন কি? আপনার পাশেই যে পৃথিবীর আরো হাজার হাজার লোক বিভিন্ন জায়গায় বসে চায়ে চুমুক দিয়ে ধন্য হচ্ছে সে কথা ভেবে আপনার শরীরে কখনও রোমাঞ্চ জেগেছে কি? এই দেখুন না কেন এককাপ চা আপনি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে 'অফার' করতে পারেন। একজন ইংরেজকে আপনি অনায়াসেই এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারেন, কিন্তু তাকে মুড়ি খেতে বলতে পারেন কি? আপনি নিজেও একজন

চৈনিকের বাড়ীতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেতে পারেন, কিন্তু তার সাথে আপনি সোনা-ব্যাঙের স্যুপ খাইতে চাইবেন কি ? তাই বলছিলাম আন্তর্জাতিক ঐক্য বলতে একমাত্র চা। আবার দেখুন এদের 'অরিজিনালিটি' সম্বন্ধে ভাবতে গেলেও প্রথমেই

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

কারণ চা এবং চিনির আগমন ঘটেছে চীনদেশ থেকে, মরিচ এলেন পর্তুগাল থেকে, আর পেয়ালা এসেছে ফার্সী-ভাষা থেকে। তারপর মিলেমিশে একাকার হয়ে এক এবং অদ্বিতীয় চায়ে পরিণত হয়ে ভারতের ঘরে ঘরে পরিবেশিত হতে থাকলেন, এবং আনন্দের সুরধুনী বইয়ে দিলেন।

বর্তমানে আমাদের সামাজিক রীতিও তো কত বদলে গেছে, তাই না? যেমন :—দেখুন—আগে নিয়ম ছিল বাড়ীতে লোক এলে তাকে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে তবে বিদায় দিতে হবে। আর এখন? এক পেয়ালা চা। আপনি যদি মুখে আপনার অতিথিকে এক পেয়ালা চা অফার করলেন, তবে তিনি মুখেই বলবেন, "থ্যাঙ্ক য়ু"। আর যদি আপনি নেহাৎই এক পেয়ালা দিলেন, তবে তাকেও সেই পেয়ালার সম্মানার্থে এক বিরাট ঢেকুর তুলতে হবে। এমন কি বিয়ে, পৈতের যে ফলাও আহার ছিল, সেটাও পর্যান্ত মাঠে মারা গেছে, ঐ চায়ের কল্যাণে। এখন সবাই ঐ এক কাপ করে চা দিয়েই আপ্যায়িত করেন। মুখে বলেন, "কি আর করি দাদা, খাওয়াবার এত ইচ্ছে ছিল, কিন্তু যে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ...।" আপনিও তখন ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বলবেন "না না তাতে কি হয়েছে খাওয়াটাই কি সব?' ওদিকে কিন্তু সত্যি সত্যিই আপনার পাকস্থলীতে এক বিরাট ভূ-কম্পন শুরু হয়ে গেছে। তার উপর উপহার হিসেবে শাড়ীও দিতে হয়েছে মাসের শেষে একখানা, চা খেতে খেতেই ভাবছেন এ কথা।

চা যে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধি দান করেছে তা অনেকেই জানেন। যেমন ধরুন "চায়ের পেয়ালায় তুফান" কথাটা তো এসেছে চায়ের থেকেই। এই একটি কথাতেই একটি বিশিষ্ট মানে বুঝিয়ে যাচ্ছে। কথাটা যদি চায়ের পেয়ালায় না হয়ে হাড়ির মধ্যে তুফান অথবা কড়ার টগবগানির মধ্যে তুফান হতো তাহলে কি মানে দাঁড়াত এবং তার শ্রুতি মধুরতাই বা কতটুকু থাকত তা আপনারাই বিচার করুন।

তাই বলছি চায়ের পেয়ালাকে সামান্য মনে করবেন না। এর ধোঁয়ার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রাজনীতির ভীষণতম জট, এর এক চুমুকেই রচিত হয় কোমলতম কাব্য। এই চায়ের পেয়ালা থেকেই জন্ম নিলো আধুনিক সাহিত্যিক মুলকরাজ আনন্দের "দুটি পাতা একটি

কুঁড়ি " তা হলে দেখতে পাচ্ছেন চা হচ্ছে সর্ব্বযুগের, সর্ব্বকালীন মানবের একমাত্র প্রাণদায়িনী, জগৎপালিনী অন্নপূর্ণা। তাই বলছি আপনাদের, আসুন, আমার সাথে সুর মিলিয়ে বলুন, চা-ই ধ্যান, চা-ই জ্ঞান, চা-ই আমার প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত চা-প্রশস্তি স্মরণ করুন, ডক্টর জনসনের চা-পানের কথা ভাবুন। সর্ব্বশেষে ছিদ্রান্বেষীদের লক্ষ্য করে আর একবার বলছি, দোহাই, আপনারা যেন আবার মনে করবেন না যে এই চা-প্রশস্তির জন্য "টি-মার্কেটিং এক্সপ্যানসান্ বোর্ড" অথবা পাড়ার বিখ্যাত চা-ঘর আমায় কেউ কিছু দেবার আমন্ত্রণও জানিয়েছে। এক পেয়ালা চা, কিম্বা, এক পিরীচ মামলেট্, কিচ্ছু না। আমি নেহাতই চাতক বৃত্তির বশে কথাগুলো বললাম।

"ভাগীরথীর পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরে সূর্য অস্ত গেল। একটা যুগের সূর্য। তার নাম মধ্যযুগ। ভাগীরথীর পূর্বে নতুন যুগের সূর্যোদয় হল কলকাতা শহরে। নবযুগের জ্যোতির কনকপদ্ম কলকাতা।"

—বিজয় ঘোষ

ছাত্র বিশৃঙ্খলা : একটি সমীক্ষা

স্বপন কুমার ঘোষ
প্রথম বর্ষ : বিজ্ঞান

আজকাল অভিভাবক, শিক্ষক, অধ্যাপক সকলের মুখে একটা রব শোনা যাচ্ছে।—ছাত্ররা আর ছাত্র নেই, তারা আজ দুর্নীতিগ্রস্ত, অন্যায় বাসা বেধেছে তাদের আনাচে কানাচে, পড়াশুনা তাদের মধ্যে থেকে আজ উধাও হয়েছে। কিন্তু কেন আজ ছাত্রসমাজের এই হাল? কেন তারা আজ দুর্নীতিগ্রস্ত, সে বিষয়ে ভেবেছেন ক'জন? ক'জন চিন্তা করেছেন বর্ত্তমান ছাত্রসমাজের এই বিশৃঙ্খলা, এই হীনতার মূল হেতু কোথায়?

একথা নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করেন যে এ যুগের ছাত্ররা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে জন্মলাভ করেনি, দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে কালের পরিবেশে। তাহলে মানতেই হবে যে এর জন্য মূলতঃ দায়ী আজকের এই পরিবেশ এবং যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় আমরা বড় হচ্ছি। এই দুরবস্থায় ছাত্রদের সামনে আবার রয়েছে—অসামাজিক পরিবেশ, অভিভাবকদের ঔদাসীন্য, শিক্ষকদের পেশাদারী মনোভাব, সার্টিফিকেট সর্বস্ব-শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতির অনুপ্রবেশ এবং সর্বোপরি জীবনে দাঁড়াবার নিদারুণ সংগ্রাম।

আজকাল বেশীর ভাগ অভিভাবকই তাদের সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাব-চরিত্রের দিকে বিশেষ নজর দেন না, সে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। আর যারা দেন তারাও প্রত্যক্ষভাবে নয়, এক বা একাধিক টিউটরের মাধ্যমে। আসলে—আজকাল অধিকাংশ অভিভাবকই তাদের সন্তানদের পড়াশুনো শেখান জ্ঞান বা মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য নয়, অন্ন সংস্থানের জন্য। ছাত্রদের মধ্যেও অনুরূপ দৃষ্টের প্রতিফলন। কোনরকমে পাশ করে সার্টিফিকেট পেয়ে একটা চাকরী যোগাড় করাই তাদের প্রধান কাজ। নতুবা এই পড়াশুনোই তাদের মতে ব্যর্থ। সত্যিই তাই আমাদের এই শিক্ষা আজ অর্থকরী শিক্ষায় পরিণত। এমন বহু দরিদ্র পরিবার আছে যে পরিবারের অসহায় বাবা-মা বসে রয়েছেন, কবে তাদের সন্তান বিদ্যার্জন শেষ করে, একটা চাকরী যোগাড় করবে, অন্ন-উপার্জনের একটা রাস্তা ঠিক করবে। এর ফলে আমাদের ছাত্রসমাজের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষার মূল্য ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে, ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে শিক্ষার পবিত্র মর্যাদা।

শিক্ষাকর্তৃপক্ষও ছাত্রদের এই দৈন্য, হীন অবস্থার জন্য কম দায়ী নন। তাঁরা স্কুল কলেজের জন্য অল্প সময়ে বেশী বিদ্যাদানের উৎসাহে যে পর্বতপ্রমান সিলেবাস নির্ধারিত

করেছেন, তা তোতাপাখীরূপী ছাত্রদের উপরন্তু শুকনো কাগজের খস্ খস্ আওয়াজ বের করার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ওপর রয়েছে বাড়ীর, পাড়ার এবং সর্বোপরি দলীয় কাজের তাগিদে লেখাপড়ায় বিঘ্ন এবং পাশ করার নিদারুণ ইচ্ছা। ফলে নির্ধারিত পাঠ্য অধিকাংশ ছাত্রের জ্ঞান আহরণের সাহায্য করার বদলে, বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বোঝা হালকা করার জন্য কেউ অংশবিশেষ মুখস্থ করে কাজ সারে, আর কেউ করে গেস-আপের তথা টোকার পথ অবলম্বন করে যতদূর মনে হয় কর্তারা যখন সিলেবাস তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁরা এদেশের শিক্ষক শিক্ষার্থীর কথা বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন। এবং তারই ফলে সিলেবাস শেষ করা আজ অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মুঠোর বাইরে। এখন দেখুন ছাত্ররা যদি কয়েকটি নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর শিখে বা টোকাটুকির ওপর ভরসা রেখে পরীক্ষার হলে গিয়ে বসে, তার জন্য সব দোষ কী তাদেরই ?

এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কথায় আসছি। বাড়ীর অভিভাবক ব্যতীত ছাত্রদের মানুষ করার ব্যাপারে তাদেরই দায়িত্ব প্রধান। কিন্তু এই দায়িত্বের পরিমাণ নিয়ে নানা মুণির নানা মত। কেউ বলেন শিক্ষক ছাত্রের সমস্ত রকম শিক্ষাদানে সাহায্য করবে, কেউ বা বলেন, না, শিক্ষকের কাজ শুধুমাত্র পুস্তকের বিদ্যাদান। তবে যে যাই বলুন, আমার মনে হয় বর্ত্তমান শিক্ষকদের শুধুমাত্র পুস্তকের বিদ্যাদান ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কারণ ছাত্রদের নিয়ন-শৃঙ্খলা, পরীক্ষায় টোকাটুকি বন্ধ, আজ আর তাঁদের হাতে নেই। অতীত যুগের ধারণা দিয়ে এ যুগের শিক্ষকদের বিশ্লেষণ অচল। অনেকে মনে করেন যে শিক্ষার্থীগণের চরিত্র গঠনে শিক্ষকদের দায়িত্ব অলিখিত। কিন্তু এ ধারণা এখন আর সত্য বলে মনে করা যেতে পারে না। ছাত্রের পিতা মাতা যেখানে উদাসীন, সমগ্র পরিবার যেখানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ দান থেকে বিরত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা যেখানে সম্পূর্ণ আলাদা সেখানে শিক্ষকদের ক্ষমতা আর কতটুকু ? তাই বলছিলাম এখন শিক্ষকদের কাজ শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমিত। ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়ে, তাদের সুনাগরিক করে তোলার ভার আজ এর তাদের মধ্যে নেই। অধিকাংশ শিক্ষকই আজকাল পরীক্ষা হলে প্রাণ ও মান হানির ভয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রসর হন না। তাদের মতে পরীক্ষা হলের ভেতরে নিরাপত্তা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে গিয়ে ? সত্যিই যুক্তিসঙ্গত কথা। তারা শিক্ষক হয়েছেন বলে তো আর জীবনটাকে যমের পায়ে ফেলে আসেন নি। বিভিন্ন হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের শাস্তি যেখানে বিঘ্নিত, সেখানে সামান্য দরিদ্র শিক্ষক তো কোন ছার ?

এবারে দেখা যাক সরকার থেকে আমরা ছাত্রসমাজ কতটা সাহায্য পেলাম। কিছুকাল আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করলেন যে শিক্ষিতেরা কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ হলে

বেকারীর সমাধান হবে না। কিন্তু কায়িক পরিশ্রমের সামান্যতম সুযোগটাই বা কোথায়? আর সে সুযোগ পাওয়া গেলেও, অশিক্ষিত বেকাররা? যারা পয়সার অভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নি, যাদের উৎসাহ থেকেও পড়াশুনোর সুযোগ ঘটে নি? তারা কী পয়সা রোজগার করতে পারবে না? না কী যেহেতু তারা "অশিক্ষিত", সেইজন্য তাদের মুখে অন্ন জুটবে না? তাই সরকারের কাছে প্রার্থনা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাইকেই চাকরীর সামান্যতম সুযোগটি, অন্ন যোগাড়ের সরু রাস্তাটি অন্তত দিন।

এধারে দেখা যাক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন নেতারা ছাত্রমনে কী ভূমিকায় আছেন। আজকাল ছাত্রদের ওপর শিক্ষক, অভিভাবকদের থেকে রাজনৈতিক দলের প্রভাব অনেক বেশী। কোনো দলের নির্দ্দেশে সেই দলের ছেলেরা করতে পারে না, এমন কাজ নেই। যে নৈতিক মূল্যবোধ আগে পারিবারিক শিক্ষার প্রথম ধাপেই ছিল, তার চর্চা আজ কটা পরিবারের ছেলেদের মধ্যে দেখা যায়? কটা পরিবারের জ্যেষ্ঠরাই বা ছোটদের জন্য আজকাল তাদের আচার ব্যবহারের মধ্যে ঐ বোধের প্রমান রাখছেন? আজ তা নেই বলেই আমরা আজ আর খুনের খবরে চমকাই না, অন্যায় অত্যাচারে প্রতিবাদ জানাই না, বা অন্যের দুঃখ দুর্দ্দশায় আমাদের অন্তর কাঁদে না। যা বলছিলাম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে ছাত্ররা কয়েক বছর ধরে বিভক্ত এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও উক্ত দলের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত। ছাত্র-সংগঠনের উদ্দেশ্য বা কাজ আমার বক্তব্য নয়, কিন্তু ছাত্র পরিচালনা আজ যাঁদের হাতে, পরীক্ষায় শান্তিরক্ষা যাঁদের হাতে, তাঁদের কাছে আমার আবেদন তাঁরা একবার ভাবুন আমাদের দীন-হীনতার কথা, সরকারের কাছ থেকে আমাদের পাওনা আদায় করে নিয়ে জীবন পথে চলতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করুন।

"শিক্ষা সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানোর একটি অন্যতম উপায়। শিক্ষা দিয়ে আমরা জীবনের সামান্যতা ও মনের মধ্যে বহু যুগের জমাট বাঁধা অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করতে পারি।"—

—রাধাকৃষ্ণণ

র বি রে খা

প্রবীরজিত সরকার
(অর্থনীতি ; পার্ট টু পরীক্ষার্থী)

'নাঃ! আর ভাল লাগে না জীবনটা'—উঁইয়ে ধরা ঝাঁঝরা কাঠের ভেঙ্গে পড়ার শব্দ যেন বেজে ওঠে অর্ধেন্দুর হতাশ্বাস ভরা কণ্ঠে। ওর পুরো নাম অর্ধেন্দুশেখর দাশ।' আমার কলেজের সহপাঠী। খ্যাপাটে ধরণের ; কেউ ওকে ঠিক পছন্দ করে না। না, বলতে ভুলে হয়ে গেল। পছন্দ করে না ওর খ্যাপামী। অবাস্তব ওর আচরণ। আমি অবশ্য ওকে মানিয়ে নিয়েছি। ও বড়ই উদার, বিশেষত বন্ধুর উদরপুর্তির ব্যাপারে। আমাকে ত' মাঝে মাঝে ঘোষ কেবিনে চপ কাট্‌লেট খাওয়ায়। চপ কাট্‌লেটের প্রতি সুগভীর মমত্ব-বোধের বশে কিনা জানি না, ওর প্রতি আমি কেমন যেন এক টান অনুভব করি। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও ঘোষ কেবিনের একপাশে একটা চেয়ার দখল ক'রে আছি, চপ নিধনের মহৎ কর্মে প্রবুদ্ধ। মুখোমুখি অর্ধেন্দু। উস্‌কো খুস্‌কো চুলে মূর্তিমান হতাশা।

'কেন? আবার কী হল?'—একটা বেয়াড়া চপকে কায়দা করতে করতে কর্ত্তব্যবোধ-বশতঃ প্রশ্নগুলো ছুড়ে ছিলাম। ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই। অগত্যা চোখ তুলে তাকাই। নিবিষ্ট মনে অর্ধেন্দু নিজের ডান হাতটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। কাজেই দক্ষিণহস্ত-কৃত্য স্থগিত অনির্দিষ্ট কালের জন্য। ওর প্লেটের আ খাওয়া চপগুলো যেন চেয়ে আছে মহানির্বাণের প্রত্যাশায়। আমার প্রশ্ন ওর কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে কিনা বোঝা গেল না। কর্ণদ্বারে আঘাত করেছে নিশ্চয়ই, তবে কিনা কানের ভিতর দিয়ে 'মরমে' পশে নি।

'কীরে, অত খুঁটিয়ে কী দেখছিস্?'—আমার অসহিষ্ণু জিজ্ঞাসা। কোন উত্তর নেই। নিজেকে বিড়ম্বিত বোধ করি। চপ সৎকারে বিরত হই। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। এই নৈঃশব্দ বড়ই অস্বস্তিকর ঠেকে। কিন্তু আমার দিক থেকে কিছুই করার নেই। শুধু প্রতীক্ষা কতক্ষণে ও নিজের মধ্যে ফিরে আসবে।

'বুঝলি সুধা, আমার বাঁচাটা নিরর্থক—futile…',—হতাশাজর্জর কণ্ঠ বেজে ওঠে অর্ধেন্দুর এতক্ষণের নীরবতাকে লঙ্ঘন ক'রে।

'হঠাৎ তোর এই জীবনান্তকারী আবিষ্কার!'—ওর কথার মাঝে বিস্ময়ের ছলে আমি খোঁচা দি'।

'কি হবে বেঁচে থেকে ?'—আমার খোঁচাকে তোয়াক্কা না ক'রে ওর অনর্গলিত কথার স্রোত চলতে থাকে, 'বাঁচা মানে বাঁচার মত বাঁচা।...'

ওঃ কী যন্ত্রণা ! বাঁচা নিয়ে এই বাচালতা না শুনে পালাতে পারলে বাঁচি। শুধু চপের মায়ায় চুপচাপ শুনে যাই। চপ গলাধঃকরণের বদলে বেচাল বাচালতা কর্ণাধঃকরণ নিড়ম্বনা ছাড়া আর কী ?

'বাঁচা মানে কি কোনরকমে একটা চাকরী যোগাড় ক'রে দশটা-পাঁচটা ডিউটি দিয়ে বাহুড় ঝোলা হয়ে রোজ বাড়ী ফেরা আর বৌয়ের সঙ্গে খুনসুটি সেই সঙ্গে 'মাস্ প্রোডে' সন্তান উৎপাদন ?'

অর্ধেন্দু ভয়ানক উত্তেজিতভাবে এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে। তারপর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দম নিয়ে আবার শুরু করে।

'আমি বাঁচা বলতে বুঝি যে বাঁচা চিরন্তন, যে বাঁচা শাশ্বত, যে বাঁচা...'—চিরন্তনের আর কোন প্রতিশব্দ চট্ ক'রে অর্ধেন্দুর মুখে যোগাল না। সেই সুযোগে আমি বলে উঠলাম, 'তুই বড় উত্তেজিত মনে হচ্ছে। ব্যাপার কী ?'

'উত্তেজিত হওয়ার কী আছে ?, শান্তস্বরে অর্ধেন্দু বলে চলে, 'অনেকদিন ধরেই এসব কথা বুকের মধ্যে জমে পাক খাচ্ছিল।'

'আর আজ সেই কথা-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'—পরিবেশ হাল্কা করার চালে টিপ্পনী কাটি।

—'তুই ভেবে দেখ এই যে আমি জন্মেছি, একদিন কলেজের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে সংসারধর্ম প্রতিপালন করব, তারপর বুড়ো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন পৃথিবীকে 'গুডবাই' জানিয়ে চলে যাব। কেউ জানবে না অর্ধেন্দু দাশ বলে কেউ এসেছিল পৃথিবীতে।'

এসব দার্শনিক কথা আমার ভাল লাগে না। কে এসব ভাবে ! হোয়াইটঅয়েল মেশানো নারকোলতেলের অসীম কারুণ্যে এমনিতেই চুলগুলো পরপারে পাড়ি দিচ্ছে। তার উপর এসব উট্‌কো চিন্তা ক'রে মাথায় টাক্‌লামাকান মরুভূমি বানাবো নাকি ! নৈব নৈব চ।

'কীরে, আজ চপ স্পর্শ করবি না পণ করেছিস নাকি ?'—কথার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করি।

প্রয়াসটা নিতান্ত ব্যর্থ হোল না। ওর প্লেটের চামচটা বারকয়েক নেচে উঠে চপ শিকার করতে চেষ্টা করল। আমার যে আরব্ধ কাজটা শেষ করতে মনটা চটফট করছিল এতক্ষণ, সেটা এই ফাঁকে সেরে নিলাম। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়।

'এরকম জীবন আমি চাইনি, চাইও না', আগের কথার রেশ ধরে ওর জীবন বিচিন্তা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলে, 'আমি মরার পর আমার নামের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, মানে চেয়েছি। কিন্তু কিছুই হবে না।'

শেষ কথা ক'টি আর্তনাদের মত শোনাল।

—'কী করে বুঝলি, হবে না? তোর তো এখন সবে উনিশ বছর। আরো তো কত বছর বাকি আছে।'

অর্ধেন্দু নিরুত্তর। এতক্ষণ পর প্লেটের দিকে মনোনিবেশ করে। আমি করার কিছু না পেয়ে চুপচাপ বসে দেওয়ালে টাঙানো একটা ক্যালেণ্ডারের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলাম। যদিও ছবিটি মামুলী, তাকিয়ে থাকার মত নয়।

'আরে তোর প্লেট যে শেষ। ছাখ কাণ্ড!'—এতক্ষণ পর অর্ধেন্দু বস্তুজগতে ফিরে আসে। শশব্যস্তে বয়কে ডেকে কিছু কাট্‌লেট্‌ আনায়। কিছুক্ষণ নীরবে ভোজনপর্ব চলে।

তুই হাত দেখায় বিশ্বাস করিস?'—হঠাৎ প্রশ্ন।

'বিশ্বাসও করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না'—আমার উত্তর।

'সে আবার কেমন কথা!'—অর্ধেন্দু বিস্মিত দৃষ্টিপাত করে। আমি খোলসা করে বলার চেষ্টা করি, 'আমি এমন কিছু প্রমাণ পাই নি যে যুক্তিসিদ্ধভাবে হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলা বিশ্বাস করব। আবার অবিশ্বাস যে করব তারও যথাযথ প্রমাণ পাই নি। কাজেই ন যযৌ ন তস্থৌ।'

আসলে আমার খেয়ে দেয়ে অনেক কাজ আছে। অতএব বহু বিতর্কিত ব্যাপারে মাথা গলাই না। চুল চেরা বিচার ক'রে মাথার চুল ছেঁড়ার উপক্রম করা আমার অপছন্দ। অর্ধেন্দুর কাছে এসব চেপে যাই।

'আমি বিশ্বাস করি', মুজিবরের বলিষ্ঠ কণ্ঠে অর্ধেন্দু বলে চলে, তোদের 'এ' প্লাস 'বি' হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা দিয়ে প্রমাণ করা না গেলেও পামিষ্ট্রি ভুয়া নয়।'

আমাকে পামিষ্ট্রিতে অবিশ্বাসী ঠাওরে অর্ধেন্দু আমাকে তাক্‌ করে ফায়ার দাগে। আমি আর কি করি? পেটেণ্ট করা মুচকি হাসি মুখে রেখে দি'। কারণ যথায় কথা বাড়ে।

'জানিস, আমাদের কুলগুরু আমার বাবার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হাত দেখে আগেভাগেই বলে দিয়েছিলেন।' কথাগুলো বলে অর্ধেন্দু একটু থামল, তারপর আমার প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বোঝবার চেষ্টা করে বলল, 'এরপরও তুই আমাকে হাত দেখায় অবিশ্বাস করতে বলিস্‌?'—অর্ধেন্দু আমার চোখে চোখ রাখে। খেয়েছে! তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ওকে প্রশমিত করার চেষ্টা করি। বলি, 'না না। আমি তোকে তো অবিশ্বাসের কথা বলিনি।' অর্ধেন্দু একটু স্বাভাবিক হয়।

'তুই জানতে চেয়েছিলি না আমি কি ক'রে আমার 'destiny'-এর কথা জেনেছি ?'—অর্ধেন্দু আমার আগেকার প্রশ্নের জবাব দিতে চায়।

'ও হ্যাঁ। কী করে ?'—আমিও আগ্রহ প্রকাশ করি।

—আমার হাতে রবির ক্ষেত্রটা ভাল নয়। হাতে রবিরেখা নেই। কাজেই 'আন্‌নোন্‌ড, আনসাং' হয়ে চলে যেতে হবে আমাকে এই পৃথিবী থেকে।

—তোর জ্যোতিষ আমি বুঝি না। রবি মানে তো জানি সূর্য। রবির ক্ষেত্র ভাল নয় মানে কি ? রবিরেখাটাই বা কি ?

—আরে বুদ্ধু, রবিই জীবনে খ্যাতি আনে। আকাশে রবি অর্থাৎ সূর্য থাকলে চারিদিক যেমন আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে, মানুষের ক্ষেত্রেও রবি ভাল হ'লে জীবনটা খ্যাতির আলোয় উদ্ভাসিত হয়। বিখ্যাত হস্তরেখাবিদ্ কিরো স্পষ্ট বলেছেন, হাতে রবিরেখা না থাকলে বুঝতে হবে জীবনটা নামহীন, খ্যাতিহীন, অগৌরবের। বুঝলি ?

বুঝলাম। কিন্তু কোথায় কোন রেখা থাকল না বলেই কি জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে ? আমার তো মনে হয় প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ তার নিজের হাতে।

'তোর কথাই সত্যি। তবে পুরো নয়, আংশিক। প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ তার হাতের রেখায়, শুধু হাতে নয়।'—অর্ধেন্দু আমার ভ্রম সংশোধন ক'রে বলে চলে, 'জানিস, প্রতিটি অবিস্মরণীয় বিখ্যাত ব্যক্তির হাতে রবিরেখা ছিল এবং থাকে। রবীন্দ্রনাথের হাতেও "প্রমিনেন্ট" রবিরেখা ছিল।'

'তাই বলে যার হাতে রবিরেখা নেই সে বিখ্যাত হতে পারবে না এরও কোন যুক্তি নেই।'—আমি লজিক আওড়াই।

'রবিরেখাই তো খ্যাতির দ্যোতক। সূর্য ছাড়া যেমন দিনের কল্পনা করা যায় না, রবিরেখা ছাড়াও খ্যাতিময় জীবনের আশা করা যায় না।' —অর্ধেন্দু জলদমন্দ্রস্বরে বলে, যেন ও একটা বড় জ্যোতিষী।

'এমনও তো হতে পারে বিখ্যাত হয়েছিলেন বলেই তাঁদের হাতে রবিরেখা দেখা দিয়েছিল'—আমি উল্টো গাওয়ার চেষ্টা করি।

'না'—অর্ধেন্দু প্রায় গর্জে ওঠে, 'পামিস্ট্রি ছেলে খেলা নয়। এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।'

আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারলাম না। হাত দেখার আবার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ! আজকাল প্রায় সব রকম সাবজেক্টের পণ্ডিতেরা স্বীয় বিষয়কে বিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা বলে থাকেন। হাত দেখা বিদ্যাও যে বিজ্ঞান হয়েছে জানা ছিল না। অবৈজ্ঞানিকমনা তুকতাক্ বিশ্বাসীদের কাছেই তো হাত দেখা বিদ্যার যত কদর।

'অবাক হচ্ছিস, তাই না?' আমার মনটা বোধ হয় পড়ে নিয়েছে অর্ধেন্দু, 'একদিন বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদেরও একথা স্বীকার করতে হবে, এই বলে রাখছি।'—দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বলে সে।

'কি সেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি? বলেই ফেল না। জ্ঞানলাভ ক'রে ধন্য হই।'—কথায় একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া। আমার ব্যঙ্গ অর্ধেন্দুর গাম্ভীর্যের মুখোশে প্রতিহত হয়। আমার উপর ওর ঠাণ্ডা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রোফেসারী কায়দায় শুরু করে অর্ধেন্দু ওর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। পামিষ্ট্রির নিগূঢ় তত্ত্ব।

আমাদের মস্তিষ্কের গূঢ়চেতনা যাকে বলে Inner Sense—ভবিষ্যৎবেত্তা। আমরা অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের যা দেখতে পাই না মস্তিষ্ক তা আগেভাগে দেখতে পায়। আর তারই প্রতিফলন ঘটায় আমাদের হাতের সাংকেতিক রেখায়। এই হাতের চেটো হচ্ছে মস্তিষ্কের চিন্তা ভাবনার দর্পণ!

ওরেব্বাস এতসব জানলি কি করে? এ ব্যাপারে দেখছি তোর অগাধ জ্ঞান।' —কিছুটা সত্যি বিস্ময় আর কিছুটা ভান করা বিস্ময়ের সুরে বলে উঠি। অর্ধেন্দুর মুখে বিজয়ীর হাসি।

'তোদের মতো তো আর উন্নাসিক নই যে, যা কিছু প্রাচীন তাকেই কুসংস্কার বলে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করব আর নিজেকে বিংশ শতাব্দীর 'আলট্রামড্' যুবক মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করবো। এ নিয়ে রীতিমত পড়াশুনা করেছি।' —অর্ধেন্দু গর্বিত বোধ করে। 'এই যে হাতের চেটোয় যে সব আঁকিবুকি দেখছিস্', অর্ধেন্দু নিজের হাতখানা আমার চোখের সামনে ধরে বলে চলে, 'এগুলো আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মস্তিষ্কের বুলেটিনকে প্রকাশ করছে। আমি যে সব টের পাই না, মস্তিষ্ক তা আগেভাগে জেনে নিয়ে হাতের রেখায় তার নির্দ্দেশ রেখে রেছে। আমি যে কবে পরলোকের টিকিট কাটব মস্তিষ্ক আগেই তা জেনে আমার আয়ুরেখায় তার নির্দ্দেশ রেখে গেছে। এই ছাখ আয়ুরেখা এইখানে শেষ হয়ে গেছে।'—অর্ধেন্দু ওর বুড়ো আঙুল বেষ্টনকারী একটা স্পষ্ট রেখার দিকে নির্দ্দেশ করে।

অর্ধেন্দু যে প্রথম পামিষ্ট্রি শিখছে বোঝা গেল। যে প্রথম ফুটবল খেলা শেখে, সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চায়ের ভাঁড়, ইঁটের টুকরোয় 'শট,' ক'রে নিজেকে প্রতি পদক্ষেপে খেলোয়াড় প্রমাণ ক'রে চলে। আজকালকার নব্য ছোকরাদের ঘন ঘন আয়নায় নিজের মুখ দেখার মত ও হাতের চেটোয় বারবার নিজের জীবনটাকে দেখতে উদ্‌গ্রীব।

'ভাবতে অবাক লাগে আমরা আমাদের জীবনপঞ্জী নিজের হাতে নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি', বলে চলে অর্ধেন্দু, 'অথচ জানি না ভবিষ্যতে কি ঘটবে। ভবিষ্যতের সুখ কল্পনায় মশগুল

আমরা কেউ কেউ, মনে বড় বড় আশা আর হাতের রেখায় নির্দ্দেশ এক অনুজ্জ্বল ভবিষ্যতের। এই যেমন ধর তুই.....'

'আমি? বলে যাও গুরু, বলে যাও',—বেশ পরিহাস করে টেনে টেনে কথাগুলো বলি। চেপে রাখি উৎকণ্ঠা।

—বড় উচ্চাশা তোর। আকাশচুম্বী পর্বতের মতো। কিন্তু তোর পর্বতপ্রমাণ উচ্চাশা প্রসব করবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মুষিক এই তোর destiny—বিধি।

চমকে উঠলাম। স্বামীসুখ কল্পনায় বিভোর শকুন্তলার কানে যদি প্রবেশ করতো দুর্বাসার জলদগম্ভীর কণ্ঠের অভিশাপ, তবে সে বুঝি এর চেয়ে বেশী চমকে উঠতে পারতো না। অর্দ্ধেন্দু কি অন্তর্যামী? ও যে বেছে বেছে ঠিক দুর্বল জায়গাতেই আঘাত করেছে! আমার যে বিরাট উচ্চাশা খ্যাতিমান কবি হবো। ছোট বেলা থেকেই এই বাসনা মনে মনে লালন করছি। স্কুল ম্যাগাজিনে দু-একটা কবিতা ছাপিয়ে অ-কবি সাধারণের কাছ থেকে সুখ্যাতিও পেয়েছি। ফলে আশা আরও বেড়েছে। দু'একটা পত্রিকাতে লেখা পাঠিয়েছি, জবাবীখামে তা ফেরতও এসেছে। তাতে দুঃখিত হলেও আশা ছাড়িনি। কারণ জানতাম বহু খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের প্রথম জীবনে পত্রিকা সম্পাদকের অবহেলার বাণে বিদ্ধ হ'তে হয়েছে। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু বলে কি! আমার অন্তরস্থিত আশা আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে! কোথায় জানি একটা ইংরাজী লাইন শুনেছিলাম—'Extremes always meet'। আজ এমন ভাবে সেটা উপলব্ধি করতে হবে ভাবিনি। একটু আগেই হাস্য-পরিহাসে মত্ত ছিলাম এখন তারই প্রায়শ্চিত্ত। অর্দ্ধেন্দুর সামান্য একটা উক্তি গাণ্ডীব নিঃসৃত অব্যর্থ বাণের মত আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করল। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর কাছে তো এসব প্রকাশ হতে দেওয়া যায় না। মুখে একটা 'ডোণ্টকেয়ার' ভাব আনার চেষ্টা করি। সামনে আয়না না থাকলেও বেশ বুঝতে পারি আমার প্রয়াসের ছাপ মুখে হাস্যকর ভাবে ফুটে উঠেছে। অর্দ্ধেন্দু একটু উদাস গোছের এই যা রক্ষে। অর্দ্ধস্ফুট হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কি করে বুঝলি আমার ভবিষ্যৎ? তুই আবার অন্তর্যামী হলি কবে?' 'তোর অগোচরেই এক সময়ে তোর হাতটা আমি স্টাডি ক'রে ফেলেছি', গর্বিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে অর্দ্ধেন্দু বলে, 'তোর তো রবিরেখা নেই অথচ তোর হাত বলছে তুই বড় উচ্চাভিলাষী।'

'রবিরেখা কোথায় থাকে দেখি?'—কৌতূহল আর দমন করতে না পেরে হাতটা এগিয়ে দি'। মনে অস্পষ্ট আশা যদি ওর আগেকার চুরি করে দেখাতে ভুল হয়ে থাকে।

'এই যে', অর্দ্ধেন্দু অনামিকার তলদেশ নির্দ্দেশ করে বলে, 'এইখান থেকে রবিরেখা নীচে নেমে যায়। স্পষ্ট, দীর্ঘ একটা রবিরেখা জীবনে খ্যাতির নির্দ্দেশ দেয়। তোর তো চিহ্নমাত্র

নেই, কাজেই তোর ভবিতব্য গাদামাঠা হরিপদের জীবন'—হাসে অর্দ্ধেন্দু। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো মনটা জ্বলে যায়।

'রবিরেখা নাই বা থাকল। কি আছে তাতে? কণ্ঠস্বরে প্রাণপণে স্বাভাবিকতা ফোটানোর চেষ্টা করি, 'নয় সাধারণ হয়েই রইলাম।'

শেষ কথা কটি বারবার আমার কানে অনুরণিত হতে লাগল—'নয় সাধারণ হয়েই রইলাম।' দুজনেই চুপ। পারিপার্শ্বের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে অন্ধকার কুঠুরীর নৈঃশব্দ্য।

এক সময় ডান হাতটা আস্তে আস্তে চোখের সামনে মেলে ধরি। বাঁহাত দিয়ে চেপে-চুপে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি একটা রবিরেখা।

যেন একটা সংক্রামক রোগ হয়েছে। এমনি ভাবে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের অনামিকার নিচেটা জোরে জোরে ঘষতে থাকি।

---

* 'অস্ফুট' চতুর্থ সংকলন থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

"শিক্ষা সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানোর একটি অন্যতম উপায়। শিক্ষা দিয়ে আমরা জীবনের সামাজ্যতা ও মনের মধ্যে বহু যুগের জমাট বাঁধা অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করতে পারি।"

—রাধাকৃষ্ণণ

সমাজ, দ্বন্দ্ব ও রাজনীতি

অধ্যাপক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন সমাজের কথা নিশ্চয় আমাদের জানা নেই যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্কে বা মানবিক আচরণ-ব্যবস্থাদিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন ছাপ নেই। এই দ্বন্দ্বের উপস্থিতি, এই সংঘাতমূলক সম্পর্ক রাষ্ট্র। রাজনীতির প্রশ্নে বোধ করি অপেক্ষাকৃত সহজেই প্রকাশ পায়। কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামগ্রিক দ্বন্দ্বের (যেমন ধরা যাক্ গৃহযুদ্ধ বা সিভিল পয়ার) নিরসন প্রচেষ্টা যেমন স্বাভাবিক ; রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, দলীয় বা সংঘগত জীবন-কর্মে দ্বন্দ্বভাবের অনুপস্থিতি কল্পনা করাও তেমনি অস্বাভাবিক। সমাজে রাষ্ট্রে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা এবং একই সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি স্থান কাল ভেদে। যেমন ভারতের জাতিভেদ, বর্ণভেদ সমস্যা বা ভাষা, আঞ্চলিকতার সমস্যা। এই বিভিন্নতার উপযুক্ত মোকাবেলা ও নীতিনির্দ্ধারণে বিভিন্নমুখী মত ও পথ প্রকাশ পায় সময় ও অবস্থার তারতম্যে উপস্থিত মানুষের কাছে। ফলত সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবনে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক ও ক্রিয়াকলাপের অনিবার্য্য উপস্থিতি। যে সমস্ত মানুষেরা তথাকথিত 'নিশ্চিন্ত' ও 'শান্তিপূর্ণ' জীবনযাপনের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকেন, তাঁরা দ্বন্দ্বের এই সার্ব্বজনীনতা ও চিরন্তনতার কথা মনে রাখলে অপেক্ষাকৃত কম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। সুস্থ, সভ্য মানুষের প্রাথমিক পরিচয় হ'ল সমাজের অবিরাম সম্পর্ক-প্রবাহে দ্বন্দ্বভাবের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং যথাসম্ভব বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় সহযোগী হওয়া।

দ্বন্দ্বের ভিত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নিজ নিজ বক্তব্য রেখেছেন। কেউ বলেছেন দ্বন্দ্বের শ্রেণীগত ভিত্তির কথা। কেউ বলেছেন ক্ষমতালিপ্সা থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের কথা। কেউবা বলেছেন সনাতন ধারা ও আধুনিকতার ধারার মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা। কোন্ বক্তব্য সঠিক বা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে ; কিন্তু দ্বন্দ্বের সারাংশের যে সামাজিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন নিয়ে সেই সম্পর্কে বোধ করি সকলেই একমত হবেন। সামাজিক সম্পদের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য্য মানবসমাজের বিবর্তনের কোন্ ধাপে তীব্রভাবে অনুভূত হ'ল এবং তার ফলে ঐ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রথম পর্য্যায়ে কি ধরণের দ্বন্দ্বভাব প্রকাশিত হ'ল তার সঠিক হিসাব দেওয়া নিশ্চয় সহজসাধ্য নয়। তবে প্রয়োজনমাফিক সম্পদ আহরণ সম্ভব হচ্ছিল না বলেই যে সামাজিক সম্পর্কে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত একথা বোধ হয় সহজেই মেনে নেওয়া যাবে। আদিম মানুষের জীবনে অন্য কি কারণে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতে পারে তা অন্তত বর্তমান লেখকের বুদ্ধিতে আসছে না।

বিবর্তনের ধাপে ধাপে মানুষের সমাজে বিভিন্ন ধরণের আচার-আচরণ, প্রথা, আদর্শ-ভাবনা এবং নিত্যনতুন শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এবং এক অর্থে বলা যেতে পারে এই সমস্ত আচার-ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে ঐ (আপেক্ষিক হিসেবে) অপ্রচুর সামাজিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এই সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন নিয়ে যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য্য, অনুরূপভাবে ঐসব আচার-ব্যবস্থা গড়ে উঠার ও প্রয়োগের ব্যাপারেও দ্বন্দ্বভাব প্রকাশিত। সেই কারণে কোন সমাজেই সর্ব্বজনগ্রাহ্য শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে কিছু নেই।

আমাদের দেশে বহুকাল ধরে চলে আসছে জাতি-বর্ণ-ভিত্তিক সামাজিক দ্বন্দ্ব। আধুনিক ভারতে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেও সে দ্বন্দ্বের বিরাম নেই। অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইন চওাল ও হরিজনদের ওপর তথাকথিত উচ্চ বর্ণের মানুষের অবহেলা, অত্যাচার দূরীকরণে বিশেষ সফল হয়েছে একথা নিশ্চয় বলা যাবে না। বরং রাজনীতির অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃতিলাভের সাথে সাথে জাতি-বর্ণের ভেদকে ক্ষুদ্র স্বার্থে কাজে লাগানো হয়েছে। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও ভাষা-আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রেও রাজনীতির দ্বন্দ্বসম্পর্কের ঐ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যাবে। এই কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দ্বন্দ্বগুলির তুলনায় সমাজের অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রের দ্বন্দ্বভাবকে গৌণ বলে গণ্য করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে সমাজ যতই এগিয়ে চলেছে সামাজিক সম্পর্কের ও ক্রিয়াকলাপের জটিলতা ও ব্যাপকতা যতই বেড়ে চলেছে, ততই অন্য সকল প্রকারের দ্বন্দ্বসম্পর্ককে ছাপিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বই মুখ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই কারণে সমাজে দ্বন্দ্বভাব উপলব্ধির বোধ করি শ্রেষ্ঠতম এবং সহজতম উপায় হ'ল সরাসরি দেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিশ্লেষণে চলে যাওয়া।

আরিস্তত্‌ল Politics কে master science মনে করতেন। আরিস্তত্‌লের সমাজে রাজনৈতিক কর্ম্ম-ভাবনার ব্যাপকতা সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলা কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে এবং দৈনন্দিন জীবনে যে আমরা উত্তরোত্তর অধিকতর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব অনুভব করছি এটা অনস্বীকার্য্য। ফলে আমাদের যুগে Politics তার 'master science' হিসেবে পরিগণিত হওয়ার দাবী সহজেই রাখতে পারে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ সমাজের বিচিত্র ক্ষেত্রের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে আলোকপাত করবে। ভারতবর্ষের সামাজিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘ ও শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাদের দ্বন্দ্বসম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে সমাজের ধর্ম্মীয়, আঞ্চলিক, ভাষাগত, জাতিগত ইত্যাদি প্রশ্নের অনুধাবন ও সমাধান সহজ হবে। তাই বলে মানুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ, ভাবনা-চিন্তার পৃথক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই এটা মনে করলে ভুল হবে।

একটি ব্যক্তি বা সংঘের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ / দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তার পারিবারিক, জাতিগত ও ধর্মগত আচার-আচরণের খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই থাকবে। ঐ সব সামাজিক ক্ষেত্রের আংশিক, ক্ষুদ্র দ্বন্দ্বভাব তার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দ্বন্দ্বভাবকে প্রভাবিত করে এটা মনে রাখা প্রয়োজন। সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্বগুলি গৌণ হলেও উপেক্ষণীয় নিশ্চয়ই নয়।

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য, দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের কৌশল / উপায় উদ্ভাবন করা। দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই দ্বন্দ্ব নিরসন নয়। দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের অর্থ উন্নততর দ্বন্দ্বভাবে উত্তরণ। সমাজপ্রবাহে দ্বন্দ্বভাবের প্রকৃতি অনুধাবনে এই উত্তরণের প্রশ্নটি বুঝেই আমরা বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার টানতে পারি।

অসভ্য মানুষের জীবনে দ্বন্দ্ব দিল একের সঙ্গে অন্যের। অপেক্ষাকৃত উন্নত বর্ব্বর মানুষের জীবনে সেই দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ বিলোপসাধন ঘটল না বটে, তবে তা উন্নততর খাতে বয়ে চলল এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সম্পর্কের মধ্যে। সভ্য মানুষের জীবনে ঐ দু'রকম দ্বন্দ্বই রয়ে গেল কম-বেশী ; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ আমরা দেখে থাকি। কিন্তু সভ্য মানুষের সভ্যতার পরিচয় এখানেই যে, সে ঐ দুই ধরণের দ্বন্দ্বভাব অতিক্রম করে একে একে জাতির সঙ্গে জাতির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, নেশনের সঙ্গে নেশনের, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং সর্ব্বোপরি সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রূপের দ্বন্দ্বে নিজেকে ছড়িয়ে দিল। আর এই শেষোক্ত দ্বন্দ্বের নিত্য-নব-রূপে নিয়ন্ত্রণই সমাজ প্রগতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। এবং বেশী বেশী মানুষ ঐ দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণে তখনই অধিকতর সহযোগীতায় সমর্থ হবে যখন তারা নিজ নিজ দেশের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম বেদনাদায়ক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন নীতি অনুসরণে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, উন্নততর দ্বন্দ্ব যা রয়েছে মানবজাতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই দ্বন্দ্বে উত্তরণই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

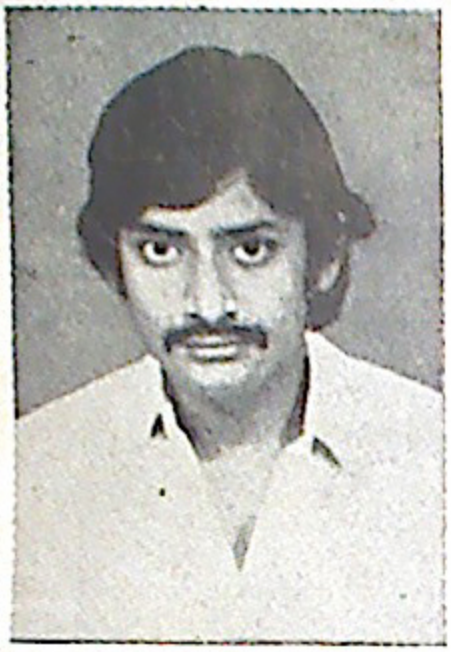

ছাত্রসংসদের কমনরুম সম্পাদক

অমিত রায়

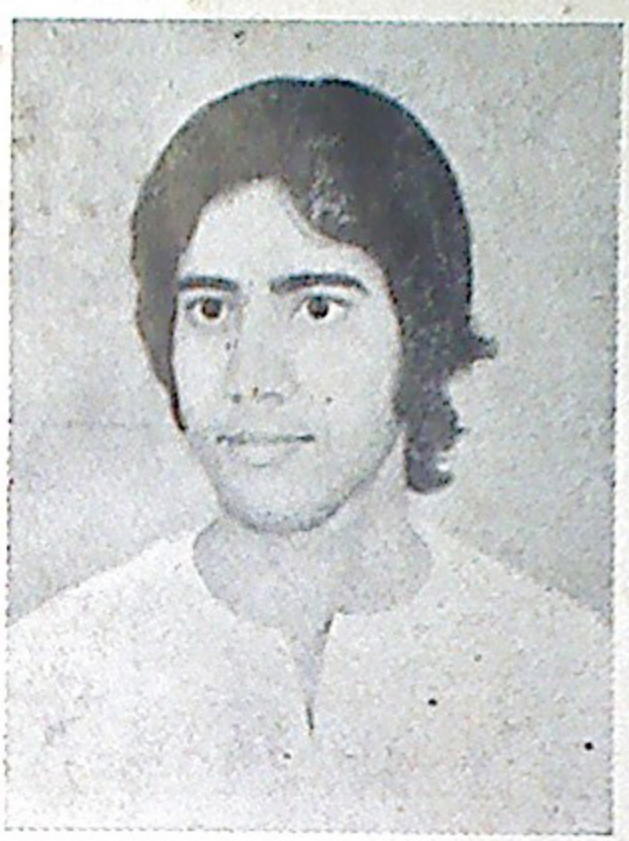

ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক
অঞ্জনলাল মুখোপাধ্যায়।

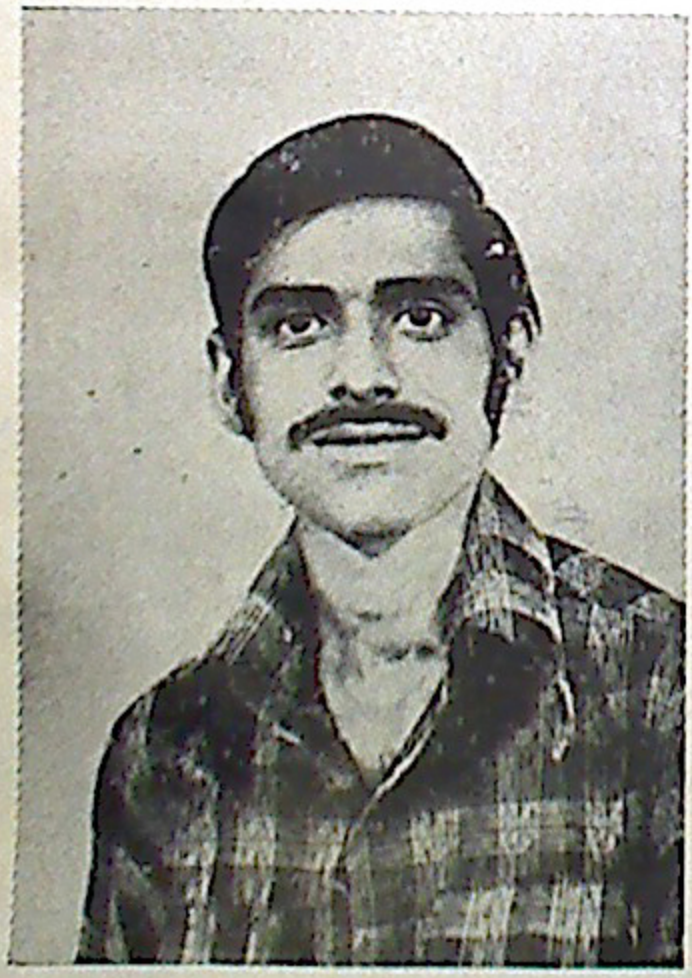

ছাত্রসংসদের সংস্কৃতি সম্পাদক
পল্টু দেবরায়।

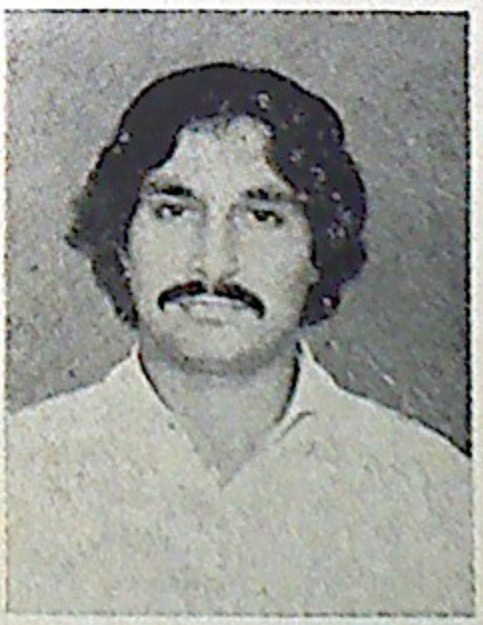

কলেজ টীমের
কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়
মোহন সিং।

এন. সি. সি. শিপ মডেলিং-এ সারা ভারতে প্রথম স্থানাধিকারী
আমাদের কলেজের ৩য় বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র সুজিত কুমার দে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন।

আশুতোষ কলেজ ছাত্রসমাচার

ক্রিড়াবিভাগের পরিচালনায় :

১৯৭৪-৭৫ সালে ছাত্রসংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হবার পর কলেজের ক্রীড়াবিভাগের গুরুদায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়ে। ভেবেছিলাম কলেজের খেলাধুলার জন্যে অনেক কিছু করতে পারব, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারি নি। কারণ তখনও সংসদের সংগঠনে শৃঙ্খলার দিন আসে নি আর আর্থিক অনটনের ভার কলেজের ভিতর বাহিরের অবস্থা দুর্গতির চরম সীমায়। ছাত্রসংসদের নির্বাচনের দীর্ঘ সাত মাস বাদে আমি পূর্ণ ক্ষমতা পাই, তার আগে আমার পূর্ববর্ত্তী সম্পাদকের নেতৃত্বে ফুটবল লীগের অর্ধেক খেলা এবং ইলিয়ড শীল্ডের খেলা পরিচালিত হয়েছে। এবার খেলা-ধুলার কথায় আসা যাক।

ক্রিকেট :

আমাদের কলেজের ক্রিকেট টীম মোটামুটিভাবে ভালই ছিল। আমরা প্রথম রাউণ্ড থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই জয়লাভ করি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার দিন আমাদের নিয়মিত কয়েকজন খেলোয়াড় অনুপস্থিত থাকার ফলে এবং ক্রীড়ানির্দ্দেশকের (আম্পায়ার) বিভ্রান্তিকর কতকগুলি নির্দ্দেশদানের জন্য আমাদের পরাজয় বরণ করতে হয়।

হকি :

হকি টীম ভালই ছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হকি লীগ প্রতিযোগিতা এবার অনুষ্ঠিত হয় নি।

ব্যাডমিন্টন :

ব্যাডমিন্টনে আমরা প্রথম রাউণ্ড থেকে বেশ ভালভাবেই জয়ের সোপান বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পরাজয়ের মেঘ আমাদের ঢেকে ফেলে কোয়ার্টার ফাইনালেই।

ফুটবল :

লীগে আমরা রেকর্ড সংখ্যক গোল (১৫টি) দিলে কি হবে ইলিয়ড শীল্ডে আমরা প্রথম রাউণ্ডেই পরাজিত হই।

খেলাধুলা :

এবারও অন্যান্য বছরের মত কলেজের বার্ষিক স্পোর্টস বা খেলাধুলার অনুষ্ঠান হয়। মোট ২৭৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

সাঁতার :

এবারের সাঁতার প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্র ভূতনাথ ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' নির্বাচনে আমাদের কলেজের দু'জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হল। ক্রিকেটে 'ব্লু' পেলেন সুজন মুখোপাধ্যায় আর সাঁতারে ভূতনাথ ঘোষ।

ক্রীড়াবিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যাঁদের উপদেশ আমাকে বিশেষভাবে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে সবার অগ্রগণ্য হলেন এই কলেজের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য। এ ছাড়া ক্রীড়াবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকবৃন্দ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রভাত রায়, শ্রীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য, শ্রীরাধাশ্যাম ঘোষ আমাকে নানাসময়ে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ সদুপদেশ দিয়ে পরিচালনকর্মে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন বলে তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া, আমার সহকর্মী তপন মজুমদার, গঙ্গাসাগর সাহা ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅর্জুন মুখোপাধ্যায় ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পল্টু দেবরায়ের সহযোগীতা ছাড়া এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কার্যপরিচালনা করা একান্তই অসম্ভব ছিল। এদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমার ক্রীড়াবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার আমি ভ্রাতৃপ্রতিম অমিতের উপর দিয়ে যাচ্ছি। আমার আশা অমিত কলেজের খেলাধুলার মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যাবে।

ক্রীড়াবিভাগের দু'একটি অসম্পূর্ণতার কথা এখানে উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রথমেই বলতে হয় খেলার মাঠের তাঁবুর (Tent) কথা। তাঁবু বলতে যা ছিল তা শতচ্ছিন্ন একটি আচ্ছাদন মাত্র। সেটিকে কিছুটা সংস্কার করেছি, নূতনভাবে রূপায়িত করার দিকে মন দিয়েছি। কিন্তু আরো অনেক কিছু করবার আছে। খেলার মাঠে তাঁবু হল খেলোয়াড়দের আরাম বিশ্রাম ও প্রস্তুতির আশ্রয়। এই তাঁবুর মধ্যে সুস্থভাবে নিরাপত্তার সঙ্গে খেলোয়াড়রা নিজেদের দেহ মনকে স্থাপন করবার সুযোগ না পেলে মাঠের কর্মক্ষেত্রে সে তার বিজয়মাল্য জিতে নেবার সুযোগ পায় না।

সবশেষে আমাদের কলেজের এবং সারা দক্ষিণ কলকাতার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দরদী ছাত্রনেতা শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখ করছি। কেননা তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই আশুতোষ কলেজের ছাত্রসমাজের সম্মান গৌরব ও মর্যাদাবোধ উচ্চশিখর স্পর্শ করেছে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রসংসদ বেশ ভালভাবেই ছাত্রদের মহৎ স্বার্থরক্ষা এবং মহত্তর দায়িত্ব পালনের একটা বড় ঐতিহ্য স্থাপন করবে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়
[ক্রীড়া সম্পাদক]

কলেজ কমন রুম :

কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়ী হবার পর কমনরুমের পরিচালনার ভার আমার ওপর ন্যস্ত হল। নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। প্রধান অসুবিধা ছিল অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। অর্থের মানদণ্ডে সাধ্য-অসাধ্যের টানাপোড়েন চলবেই। বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশের মাঝখানে সাধ্যের সঙ্গে অসাধ্যের সমতা বজায় রেখে সমস্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছি। আজ আনন্দ হচ্ছে জানাতে যে আমাদের কলেজের ছাত্র সর্বভারতীয় দাবা প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আমাদের কলেজ তথা বাংলার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। এ গৌরব আমাদের কলেজের গৌরব।

এবার আন্তবিভাগীয় টেবিল টেনিস ও কেরামের ঘরোয়া খেলায় অংশ নিয়েছিল ৫৬ জন প্রতিযোগী। দক্ষ প্রতিযোগীদের উন্নত মানের খেলায় প্রতিযোগীতাকে দর্শণীয় করে তুলেছেন খেলোয়াড়েরা। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় বিজয়ী বারোজন খেলোয়াড়কে পুরস্কার বিতরণ করে ছাত্রজীবনে খেলাধুলার বিশেষ করে ঘরোয়া খেলার অপরিহার্য মূল্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনেক প্রতিকূলতা সত্বেও ছাত্র শিক্ষক-অশিক্ষক ও সংসদের সভ্যদের, বিশেষত প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের অকৃপণ সহযোগীতায় কমনরুমের পরিবেশকে মনোরম ক'রে তোলা সম্ভব হয়েছে। আশা করি এ হৃদ্যতা চিরকাল অটুট থাকবে।

এবারের সম্পাদকের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি তিনি আমার চেয়েও সুন্দরভাবে কমনরুমের খেলাধুলা পরিচালিত করে কলেজের গতানুগতিক ধারাকে অকেজো প্রথামুক্ত করে যুগধর্মের অবক্ষয়ী সংঘাত বাঁচিয়ে নূতনত্বের স্বাদ নিয়ে আসবেন। রেখে যাবেন আগামী দিনের ছাত্রসংসদের সামনে খেলাধুলা আমোদ প্রমোদের স্বাস্থ্য প্রাণ ও পরমায়ুর বৃহত্তর আদর্শ। সেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমার অকুণ্ঠ সহযোগীতা ছায়ার মত অনুগামী হবে।

অমিত রায়
কমনরুম সম্পাদক

সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে দু এক কথা :

১৯৭৪-৭৫ সালের ছাত্রসংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হইবার পর আমি ভীষণ চিন্তিত হয়েছিলাম যে এতবড় একটা কলেজের এই দপ্তর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারব কিনা ? কিন্তু আমার সহকর্মীদের সহযোগীতায় আমি সফল হতে পেরেছি বলে আমার ধারণা।

কলেজে নবীন বরণ উৎসব বেশ নামী দামী শিল্পী দ্বারা সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এরপর কলেজে আন্তঃ শ্রেণী আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু বিহারের পাটনা ও পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের বন্যার জন্য বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সীমিত করতে হয়েছিল কারণ এই খরচ কমিয়ে আমরা ৫০১৲ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের অদ্বিতীয় ছাত্রনেতা ও মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়-এর হাতে তুলে দিই।

সবশেষে আমার সাংস্কৃতিক দপ্তর পরিচালনা করতে যারা নানাভাবে সাহয্য করেছেন তাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তারা হলেন— অধ্যক্ষ শ্রীনীরোদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপকমণ্ডলী, ছাত্রসংসদের সম্পাদক শ্রীঅঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়। জয় হিন্দ বন্দেমাতরম্

পল্টু দেবরায়
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ নূতন ছাত্রাবাস
(কালীঘাট রোড)

কলেজের অনুমোদিত এবং পরিচালিত ছাত্রাবাস। সান্ধ্যানিক পাঠক্রমের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত। ১৯৭৪-৭৫ বি.এ শেষ পর্যায়ে পরীক্ষা দিয়েছিল ৪ জন। সকলেই সম্মানের সংগে পাশ করেছে, একজন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। পি, ইউ, দিয়েছিল ৪ জন—একজন অকৃতকার্য হয়েছে. বি,এ, বি,এস,সি, বি,কম, পরীক্ষায় প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৪ জন—সকলেই সম্মানের সংগে পাশ করে এবার শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা দিয়েছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও এই ছাত্রাবাস পিছিয়ে নেই। গতবার ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল প্রতিযোগীতামূলক খেলায় এরা কেবল জয়লাভ করে নি বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরও রাখতে পেরেছে। এ বছর এই ছাত্রাবাসের আবাসিক তৃতীয় বর্ষের বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রীঅসিত কুমার রায় কলেজের ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে।

নেতাজী দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস গাম্ভীর্যপুর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত ও প্রতিপালিত হয়েছে। সরস্বতী পুজা মহা আড়ম্বরে এবং জাঁক জমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে আবাসিক তৃতীয় বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র শ্রীসুবোধ সরকারের মণ্ডপের সাজসজ্জা, অলংকরণ ও আলপনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছাত্রাবাসের সকলেই দীঘা পরিভ্রমণে গিয়েছিল।

এই ছাত্রাবাসের সুকঠোর নিয়মশৃঙ্খলা নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য অধীক্ষকের সদা সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। ইতি—

বিমলেন্দু মাইতি
সাধারণ সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস
(বসন্ত বসু রোড)

"ঐ যে ছাত্রাবাসটি যাচ্ছে দেখা বসন্ত বোস রোডের ধারে
রূপে, গুণে পরিপাটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে"—

এমন একটি ছাত্রাবাস আমাদের আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস। দক্ষিণ কলকাতার একমাত্র ঐতিহ্যপূর্ণ এই ছাত্রাবাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, দক্ষিণ কলকাতার কলেজগুলির আর কোনটিরই নিজস্ব ছাত্রাবাস নেই, এটাই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ছাত্রাবাস। নেপাল, সিকিম, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা থেকে শুরু করে দিল্লি, আসানসোল, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর আর সুন্দরবন পর্যন্ত সবাইকে একত্র ঠাঁই দিতে পেরেছে আমাদের ছাত্রাবাসের ঐ আটচল্লিশখানা চৌকি। ছাত্রাবাসটির ৩/৪ খানা ঘর বাদ দিলে বাকী সব ঘরই প্রায় এক আসনের যা লেখাপড়া করবার পক্ষে অনুকূল। ঘরগুলোর চেহারা আয়তনে খুব একটা বড় না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। চারতলা, তিনতলা, দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে আমাদের নীচে নামতে হয় খাওয়ার ঘরে আসন সংগ্রহের জন্য। এই দুর্মূল্যের বাজারে আমাদের ছাত্রাবাসে খাওয়ার-দাওয়ার পরিবেশ যেরূপ, বোধ করি এই মহানগরীর অন্য কোন ছাত্রাবাসেই সে পরিবেশ নেই। দুবেলা মাছ, অন্যূন একটা তরকারি, ডাল, চাটনি, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন মাংস, প্রত্যহ বিকালবেলা জলখাবার যেমন লুচি-শুজি, পাঁউরুটী-জলা, শিঙ্গাড়া-অমৃতি—এগুলোই হচ্ছে আমাদের ছাত্রাবাসে দৈনন্দিন পরিবেশিত খাদ্যবস্তু। লেখাপড়ার পরিবেশও ছাত্রাবাসে খুবই সন্তোষজনক। কেননা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম হতে দশম স্থানাধিকারীদের অনেকেই আমাদের এই ছাত্রাবাস অলংকৃত করে আছে। ছাত্রাবাসের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক অজয় কুমার সেন ছাত্রাবাসের উন্নতিকল্পে সর্বদাই সচেষ্ট আছেন। তিনি সর্বদাই আবাসিকদের অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ খবর নেন। মাস গেলে ছাত্রাবাসের চৌকি ভাড়া সাড়ে দশ টাকা, অন্যান্য খরচ আরো দশ টাকা। দু'বেলা খাওয়া ও বিকেলের জলখাবারের জন্য লাগে আশি থেকে নব্বই টাকা। মেস খরচার হিসাব পত্তর রাখবার ভার আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। টাকাটা থাকে অজয়বাবুর কাছে। ভূতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীসেনের অপর পরিচয় তিনি একজন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার, প্রয়োজনে আবাসিকদের চিকিৎসা করেন। এ ছাড়া কলেজের নিজস্ব ডাক্তার রয়েছে ছাত্রাবাসের জন্য। আমরা আবাসিকরাই চাঁদা তুলে একটি ছোট্ট গ্রন্থাগারও গড়ে তুলেছি। এক আলমারি বই, সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও শ'দুয়েক হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের নিজেদের সংগৃহীত, তাই রীতিমত গর্বের বিষয় এই গ্রন্থাগার।

জয় হিন্দ,

শ্রীরূপ কুমার নন্দ

LIST OF EDITORS
1946-1973

Editor in chief : Pijuskanti Chatterjee, Arun Kumar Dasgupta. Naresh Chandra Ghosh, Suhas Kumar Roy, Ramprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjukta Kar and Miss Srimati Chakravarty (1946).

Editor-in-chfef : Sobhanlal Mukherjee, Arun Mukherjee, Asoke Sengupta Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Miss Puspanjali Sen (1947),

Editor in chief : Tejen Guha Roy. Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Dasgupta, Pratul Bardhan Roy, Prithiwis Roy Choudhury, Prankrishna Bhattacharya and Bireswar Banerjee (1948).

Satyen Mukherjee and Miss Jayasree Choudhury (1949)
Madhusudan Ghosh (1950)
Arun Kumar Roy (1951), Smritibikash Ghosh (1952)
Dulal Das (1953)
Gopal Chandra Banerjee (1954)
Samarendra Sengupta (1955)
Ashim Sengupta (1956), Malayasankar Dasgupta (1957)
Ajay Gupta (1958)
Tripti Kumar Chatterjee (1959)
Gopal Bandyopadhyay (1960)
Sukanta Kumar Roy (1961)
Barun Kumar Banerjee (1962)
Jayanta Kumar Roy, Amit Kumar Ganguly (1963)
Ashim Thakur, Suprakash Saha (1964)
Satyabrata Sanyal, Bhabesh Ch. Basu (1965)
Bhagirath Misra, Hiraksubhra Pandey (1966)
Ajit Kumar Mukhopadhyaya, Ranadev Sarkar (1967)
Biswarup Roy Choudhury, Bhabani Prasad De (1968)
Jiten Bhowmik, Chandra Sekhar Chokraborty (1969-70)
Mukundalal Bhattacharjee (1971-72)
Pantu Dev Rai, Amitava Mitra (1972-73)

Statement about ownership and other particulars of the Asutosh College Magazine—

1.	Place of publication	Calcutta
2.	Periodicity of publication	Yearly
3.	Printer's Name Nationality Address	Principal, Asutosh College Indian 92, Shyamaprasad Mookherjee Road, Calcutta-26
4.	Publisher s Name Nationality Address	Principal, Asutosh College Indian 92, Shyamaprasad Mukherjee Road, Calcutta-26
5.	Editor's Name Nationality Address	Pinaki Prosad Roy Indian Asutosh College, Calcutta-26
6.	Names and Address of the individuals who own the newspaper or publication	Asutosh College

I, Nirod Kumar Bhattacharjee hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- N. K. Bhattacharjee
PUBLISHERS
ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

The magazine is printed and published in the official capacity of the principal. The name of the Principal is Nirod Kumar Bhattacharjee.